ভে ত রে

কালো টাকা নিয়ে বিজেপির দ্বিচারিতা ... ২
প্রধানমন্ত্রীকে নরেগা সংক্রান্ত চিঠি অর্থনীতিবিদদের ... ৩
কয়লা বেসরকারীকরণে মোদী আগ্রাসী উদ্যোগ ... ৪
জমি অধিগ্রহণ আইনকে বাতিল করেছে মোদী ... ৫
মুখ ঘোরাচ্ছে তৃণমূল ... পরীক্ষা পৌরনির্বাচন ... ৬
দিল্লীতে পোশাক কারখানায় শ্রমিক সংগ্রাম ... ৭

গণদাবী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৩৬ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৬ নভেম্বর ২০১৪

চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে মহতি নাগরিক কনভেনশন

উত্তরবঙ্গের ৪.৫ লাখ বুভুক্ষু চা শ্রমিক পরিবারের জন্য প্রকৃত মূল মজুরি ও পরিবর্তনশীল মহার্ঘভাতা সহ ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ঘোষণার দাবিতে, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে চলমান গণআন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের ২৭৩টি চা বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধি ২৪টি ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ 'যৌথ ফোরাম'-এর আহ্বানে ১ নভেম্বর জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ হলে ও ২ নভেম্বর শিলিগুড়ি শহরের মিত্র সম্মিলনি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল দুটি মহতি নাগরিক কনভেনশন।

পার্শ্ববর্তী দুটি শহরেই বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত গণতান্ত্রিক অগুন্তি নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্তম্ভ চা শিল্প। এই শিল্প দেশকে প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহে সাহায্য করে চলেছে। চা শিল্পে উৎপাদন ও মুনাফা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। চা-র চাষ দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। মালিকদের জন্য বহুমুখী সরকারি সহায়তা ও ভর্তুকি অবারিত। অথচ এখানে কর্মরত শ্রমিক পরিবারগুলোর সুস্থভাবে বাঁচার জন্য একান্ত জরুরী বিশেষ আইনে অধিকার প্রদানে চা মালিকরা দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের দায়িত্ব লঙ্ঘন করে চলেছেন। শ্রমিকদের জীবন যন্ত্রণা ও দুরবস্থা শেষ সীমায় পৌঁছেছে। বহু শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বাগান ছেড়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছেন। মালিকদের একাংশ এমনকি শ্রমিকদের সারা জীবনের কষ্টার্জিত প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাৎ করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন।

মালিক পক্ষের তরফে ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী ন্যায্য মূল মজুরি ও মহার্ঘভাতা প্রদানের দায়বদ্ধতাকে অনবরত নস্যাৎ ও রাজ্য সরকারের তরফে উদাসীনতার সাথে তাঁদের আইন ও সাংবিধানিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতাকে রুখে দিতে, চা শ্রমিকদের প্রতি এই সকল অন্যায় ও নির্যাতন বন্ধের এবং অভিযুক্ত মালিকদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি সোচ্চারে ঘোষিত হয় কনভেনশন দুটিতে।

জলপাইগুড়িতে বক্তব্য রাখেন শহরের প্রখ্যাত দুই বর্ষীয়ান আইনজীবী কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জী ও ধীমান দত্ত, সমাজসেবী ডাঃ সুজিত ঘোষ ও সঞ্জয় চক্রবর্তী, চা শ্রমিক আন্দোলনে দীর্ঘ ছ-দশক ধরে নেতৃত্ব দিয়ে যাওয়া 'জয়েন্ট ফোরাম'-এর শ্রদ্ধেয় অশীতিপর নেতা চিত্ত দে ও জিয়াউল আলম। কনভেনশনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকেন পার্টির রাজ্য কমিটির নেতা বাসুদেব বসু। সহযোগিতার স্বাক্ষর রেখে উপস্থিত ছিলেন জেলা এ আই সি সি টি ইউ এবং পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শিলিগুড়ির কনভেনশনে রঞ্জিত মুখার্জীর উদাত্ত গণসঙ্গীত পরিবেশনের পরে চা শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে মূল প্রস্তাব পাঠ করে শোনান অভিজিৎ মজুমদার। প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজিত রায়, পাহাড়ের শ্রমিক নেতা তিলক চাঁদ রোকা, সমাজসেবী পীযূষ রায়, রূপক মুখার্জী, পুলক গাঙ্গুলী, সুপদদা; শিক্ষিকা রীতা ঠাকুর; চিকিৎসক ডাঃ গৌতম দাশগুপ্ত ও ডাঃ দেবেন্দ্র প্রসাদ মহন্ত; সংস্কৃতি কর্মী শুভময় সরকার; সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য নেতা বাসুদেব বসু, সি পি এমের পক্ষে অশোক ভট্টাচার্য, সি পি আই-এর পক্ষে অনিমেষ ব্যানার্জী, আর এস পি-র পক্ষে তাপস গোস্বামী, এস ইউ সি আই-এর পক্ষে গৌতম ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের পক্ষে মিনু রায়চৌধুরী, সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের নেতা রামেশ্বর বক্সী প্রমুখ।

চা শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলনের সমর্থনে কনভেনশনগুলো থেকে আহূত ১১-১২ নভেম্বর ৪৮ ঘন্টার চা শিল্পের ধর্মঘট ও ১২ নভেম্বর ১২ ঘন্টার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলা এবং ইসলামপুর ও মেখলিগঞ্জ মহকুমায় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে আগামী ৮ নভেম্বর দুটি শহরেই বিপুল উদ্দমে নাগরিক মিছিল সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জয়েন্ট ফোরামের আহ্বানে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের মেকলিগঞ্জ ও উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে চা বাগিচায় যুক্ত চার লক্ষাধিক শ্রমিকের ওপর নানা বঞ্চনার বিরুদ্ধে ও ন্যায্য মজুরি ও ভাতার দাবিতে ১১ নভেম্বর চা বাগিচা ক্ষেত্রে ও ১২ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে বাবুরহাটে মিছিল ও পথসভা করা হয়। মিছিলে আওয়াজ ওঠে—সরকারকে চা শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে; চা শ্রমিকদের পরিবর্তনশীল মহার্ঘভাতা দিতে হবে; ('৯৫ নয়) ন্যূনতম মজুরি ১৩৪ টাকা করতে হবে; মজুরি আইন অনুযায়ী মজুরি নেই কেন জবাব দাও—অভিযুক্ত মালিকদের গ্রেপ্তার করতে হবে। বক্তব্য রাখেন তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ থেকে সুনীল কুমার রায়। তিনি বন্ধ চা বাগানগুলোর বাস্তব করুণ চিত্র সরকার ও মালিক শ্রেণীর টালবাহানার নানা দিক তুলে ধরেন এবং আগামী ৮ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার মিউনিসিপালিটি হলে জয়েন্ট ফোরামের নাগরিক কনভেনশন সফল করতে এবং ১১ নভেম্বর চা শিল্পে ও ১২ নভেম্বর ১২ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা সদস্য সুশীল চক্রবর্তী ও জন্মেঞ্জয় সিংহ রায়।

আগামী ৭-৮ নভেম্বর প্রতিটি বাগানের সম্মিলিত যোগদানের মধ্য দিয়ে সকালে কাজের যাওয়ার আগে ১ ঘন্টা করে গেট মিটিং করা হবে।

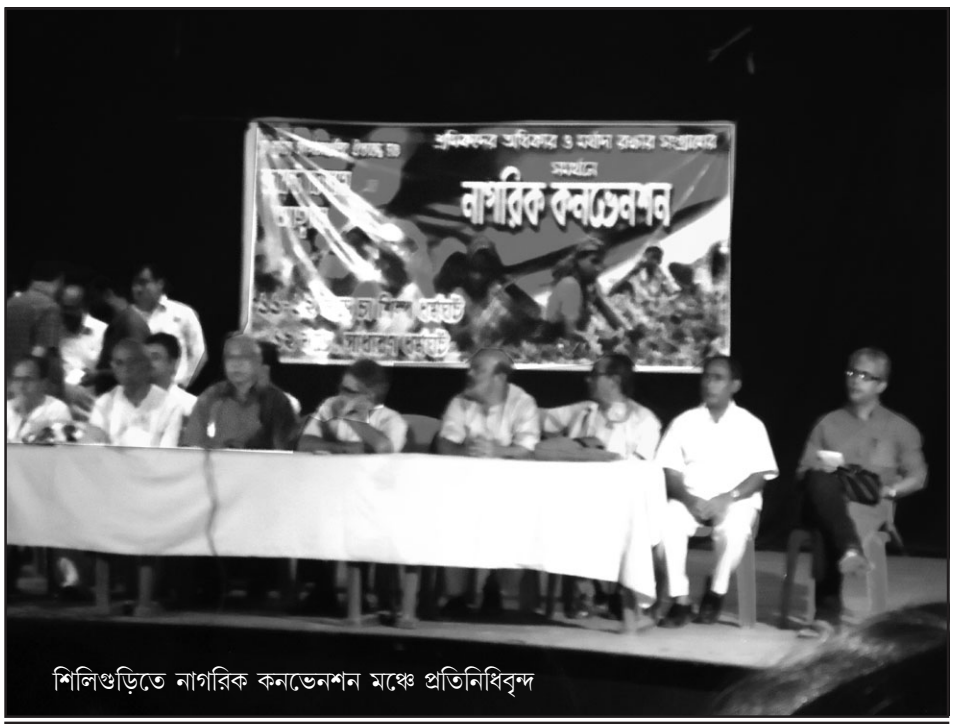

শিলিগুড়িতে নাগরিক কনভেনশন মঞ্চে প্রতিনিধিবৃন্দ

ছয় বামদলের আগামী ডিসেম্বরে সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদী অভিযানের সিদ্ধান্ত

বাম দলগুলোর প্রেস বিবৃতি, নয়া দিল্লী, নভেম্বর '১৪

নয়া দিল্লীতে ১ নভেম্বর সি পি আই (এম), সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন এবং এস ইউ সি আই (সি)—এই ছয়টি বামপন্থী দলের এক বৈঠক হয়। তাদের প্রচারিত এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ

মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে কর্পোরেট-হিন্দুত্বের শক্তিগুলোর দ্বারা ইন্ধন পেয়ে সুপরিকল্পিতভাবে এক দক্ষিণপন্থী আক্রমণ চলছে। নয়া উদারবাদী নীতিগুলো চাপিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ নামানো হয়েছে যার ফলে জনগণের বেঁচে থাকাটা প্রচণ্ড দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি ও দুর্নীতি থেকে জনগণের রেহাই মিলছে না।

হিন্দুত্বের শক্তিগুলো আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের পথ নিচ্ছে। মোদী সরকারের মদতে আর এস এস এবং তার অন্যান্য শাখাগুলো শিক্ষামূলক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোর সাম্প্রদায়িকীকরণকে তাক করেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ছে।

বাম দলগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিচের ইস্যুগুলো নিয়ে আগামী ৮ থেকে ১৪ ডিসেম্বর সপ্তাহজুড়ে প্রতিবাদী অভিযান হবে ঃ

(১) এম এন আর ই জি এ-কে কাটছাঁট ও লঘুকরণের পদক্ষেপ নেওয়া চলবে না।
(২) মূল্যবৃদ্ধি রোধ কর, ওষুধ ও জীবনদায়ী ওষুধের চড়া দাম নিয়ন্ত্রণ কর।
(৩) বীমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ চলবে না।
(৪) কালো টাকা খুঁজে বার করতে দৃঢ় ব্যবস্থা নিতে হবে।
(৫) রাষ্ট্রের শিক্ষা, গণপ্রচার মাধ্যম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আর এস এস এবং হিন্দুত্বের মতাদর্শ ঢোকানো বন্ধ কর।
(৬) ''লাভ জেহাদ'' ঘৃণ্য অভিযান ও অন্যান্য রূপের সাম্প্রদায়িক প্রচার বন্ধ কর।
(৭) সংখ্যালঘুদের ও তাদের অধিকারের ওপর আক্রমণ বন্ধ কর।
(৮) মহিলাদের ওপর হিংসা ও অন্যান্য লিঙ্গগত হামলার বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং
(৯) দলিতদের ওপর অত্যাচার ও অন্যান্য জাতি উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই কর।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঃ

দেবব্রত বিশ্বাস (ফরওয়ার্ড ব্লক), ক্ষিতি গোস্বামী ও মনোজ ভট্টাচার্য (আর এস পি), স্বপন মুখার্জী ও কবিতা কৃষ্ণাণ (সি পি আই (এম এল) লিবারেশন), মানিক মুখার্জী ও রণজিৎ ধর (এস ইউ সি আই (সি), এ বি বর্ধন ও ডি রাজা (সি পি আই) এবং প্রকাশ কারাত ও রামচন্দ্রন পিল্লাই (সি পি আই (এম)

সম্পাদকীয়

যেমন বিস্ময়কর তেমনি বিপজ্জনক

বীরভূম জেলা এখন এরাজ্যে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যেকার লাগাতার সংঘর্ষ চলার শীর্ষসংবাদে চলে আসছে। পাড়ুই, চৌমণ্ডলপুর, মাকড়া—রক্তঝরা এই গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক চর্চায় উদ্বিগ্ন হওয়ার মতই প্রাত্যহিক বিষয়। সবশেষে মাকড়ার ঘটনাবলীর ধারা বেশ চিন্তিত হওয়ারই। পুলিশ বাহিনী গ্রামের বাইরে রাস্তায় উপস্থিত থাকলেও থেকেছে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। আর বাইরে থেকে গ্রামে বোমা-গুলি নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী। দূরদর্শনের পর্দায় ভেসে ওঠা এই দৃশ্য বিগত আমলে নন্দীগ্রাম আক্রমণের দৃশ্যায়নকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। শাসকের পরিবর্তন হয়েছে, শায়েস্তা করার ধরনে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ওপরের গ্রামীণ অঞ্চলগুলো একটা বড় সময় যাবত সাধারণভাবে বামমনস্ক ছিল এবং ঘাঁটি ছিল সরকারি বাম দলগুলোর। তারপরে রাজ্যে পালা বদলের পালা শুরু হওয়ার ঝোড়ো সময় থেকে বামেদের জায়গায় দখল পায় তৃণমূল। বলাবাহুল্য ক্ষমতাসীন তৃণমূলের খুনে রাজনীতি ও ক্ষমতার কামড়াকামড়িতে বেড়ে চলা গোষ্ঠী সংঘাতের পরিণামে নিরাপত্তা ও প্রতিকারের খোঁজে ডাক পেতে থাকে বিজেপি। রাঢ়বঙ্গের এই বীরভূমে বিজেপির মাতব্বর পার্টি হয়ে ওঠার পেছনে সত্যকাহিনী এটাই। এককথায়, তৃণমূল, তৃণমূলের সন্ত্রাসের রাজনীতি ও সীমাহীন দুর্নীতিই খাল কেটে ও মাটিতে বিজেপির শেকড় গাড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ওখানে আরও যেটা আশ্চর্যের, একটা হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক-কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী দল, যার 'গরিবী হটাও'-এর দেশব্যাপী কোনো সংস্কার ও আন্দোলনের কর্মসূচী করে দেখানোর শ্লোগান আওড়ানোর বড় মুখ নেই, যে দলটা যা খুশী করার ভারতে এসে তৈরী করতে বলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্বাহু আবেদন জানাচ্ছে, এদেশের সরকার ও কর্পোরেট পুঁজিকে দোসর করতে করজোড়ে অনুরোধ করছে, সেই বিজেপি অথচ উপরোক্ত গরিব মুসলিম জনতা গ্রামগুলোতে পরিত্রাতার জায়গা পেয়ে যাচ্ছে! অনভিপ্রেত হলেও এটা যেমন বিস্ময়কর তেমনি বিপজ্জনক। পুলিশ-প্রশাসন সেখানে কত ন্যক্কারজনক জো-হুজুরের ভূমিকায় তার আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ হল, পাড়ুই থানার ওসির নির্দেশে এক নির্দোষ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শুধুমাত্র তা নয়, যুবকটিকে পুলিশের হেফাজতে রাখা অবস্থায় আবার দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করার দাবি আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশের চৈতন্য খেয়েছে বিচারপতির ভর্ৎসনা। ১৪৪ ধারার পরিস্থিতিতে শাসকদল তৃণমূল বাহিনী হামলা চালানোর সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু যে সমস্ত দল আক্রান্ত মাকড়া পরিদর্শনে গেছে তাদের কাউকেই আইনি বিধিনিষেধের কথা শুনিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি; ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিল বিজেপি, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট প্রতিনিধিদল, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগঠন, এমনকি কোনও কোনও বিশিষ্ট মহিলা সমাজকর্মী। তাদের অনধিকার প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিসরটুকু দেওয়া হয়নি। পরে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে গ্রামের ভেতর থেকে এবং বিরোধী রাজনীতির দিক থেকে ব্যাপক চাপ ওঠার ফলেই। চাপে পড়ে পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে তারা তৃণমূলের, তবে একেবারেই হাল্কা কেস দেওয়া হয়েছে। চাপে পড়ে প্রশাসন যদিও ক্ষতিপূরণ দিয়েছে নিহতদের পরিবারবর্গকে, কিন্তু দেওয়া হয়েছে এমনকি আক্রমণকারীদের দলের সংঘর্ষে নিহত দুজনকেও; এনিয়েও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে বিস্তর। প্রশাসনের দিক থেকে প্রথমে আক্রান্তদের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া ও ত্রাণ সাহায্যের প্রশ্নে কোন হেলদোল ছিল না, যখন বাইরে থেকে ত্রাণ সাহায্য আসার চাপ তৈরী হল একমাত্র তখনই প্রশাসন ত্রাণবিলি করতে শুরু করে। সুতরাং প্রশাসন কতখানি নির্দয় পক্ষপাত; টালবাহানা দেখিয়েছে সেটা পরিষ্কার।

বিজেপি খাগড়াগড় কাণ্ডের পর মাকড়াকাণ্ডকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার বড় ইস্যু করতে মরীয়া। বিজেপি যেমন খাগড়াকাণ্ডকে ইস্যু করে সন্ত্রাসবাদীদের বিপদের জিগির তুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভীতি সঞ্চার করতে নিরাপত্তা পেতে হলে বিজেপির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার বার্তা দিতে চাইছে। আবার একইসঙ্গে বিজেপি মাকড়ার মতো অন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেখানে 'সংখ্যালঘুদের পরিত্রাতার রাজনীতির ফেরি করা' রাজ্যের শাসকদলের হাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরিব জনতা আক্রান্ত হচ্ছে, সেখানে ঐ জনতার পাশে থাকার গণতান্ত্রিক ভাবভঙ্গী নিয়ে ঢুকে পড়ছে। দুভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজেপি নিজের ভোটশক্তির সম্প্রসারণ ঘটাতে প্রচণ্ড তৎপর ও সক্রিয়।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার বিরুদ্ধে কলকাতায় পার্টি প্রচার

বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলায় মুসলিম ভীতি-বৈরিতা ও বিদ্বেষ তৈরী করার কাজে নেমে পড়েছে সংঘ পরিবার, বিজেপি এবং আর এস এস-এর সেবকরা। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে একদিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার অপরদিকে পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট করে নিজের পায়ের জমিকে শক্ত করা ও অনুপ্রবেশের ইস্যুকে তুলে শ্রমজীবী ঐক্যে বিভাজন সৃষ্টি করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৩১ অক্টোবর কসবা গোলপার্ক, ভি আই পি বাজার, তপসিয়া, পার্কসার্কাস, বীরশুল হাট, কলেজ স্ট্রীট ও রাজাবাজার অঞ্চলের সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে প্রচার ও লিফলেট বিলি করা হয়। এই প্রচার কর্মসূচীতে জেলা সম্পাদক সহ অন্যান্য জেলা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ভি আই পি বাজার, কোহিনুর মার্কেট (তপসিয়া), পার্কসার্কাস, কলেজস্ট্রীট ও রাজাবাজার অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত পথসভা করে বক্তব্য রাখেন দিবাকর ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী দত্ত, অতনু চক্রবর্তী, তরুণ সরকার, মিথিলেশ সিং, অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী ও অন্যান্যরা। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সন্ত্রাস ও দাঙ্গার রাজনীতিকে প্রতিহত করা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণের গণতন্ত্র ও জীবন-জীবিকার উপর হামলার প্রতিরোধ করা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি ও সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুটি-রুজি-গণতন্ত্রের লড়াইকে শক্তিশালী করেই বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করার আহ্বান রাখেন। এ রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিষিয়ে তোলার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বানও তুলে ধরে জনগণকে সোচ্চার হতে বলেন।

এছাড়া কলকাতার বেহালা অঞ্চলে, পূর্ব বেহালা বিধানসভার অন্তর্গত পশুপতি ভট্টাচার্য রোডের চড়কতলা, কালিতলা, কলোনী বাজার সহ বীরেন রায় রোডে অবস্থিত মুচিপাড়া, মদনমোহনতলা, পঞ্চাননতলা ও জেমস লঙ সরণীতে ব্যাপক প্রচার ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলোতে প্রচুর সংখ্যায় লিফলেট বিলি করা হয়। বেহালা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে জেলা কমিটির সদস্য অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী, সৈকত ভট্টাচার্য, মিথিলেশ সিং, গোবিন্দ মান্না প্রমুখ আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভা চালাকালীন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তনু ভট্টাচার্য।

কালো টাকা নিয়ে বিজেপির দ্বিচারিতা

২০১৪-র নির্বাচনে জয়ী হওয়া বিজেপি তাদের নির্বাচনী প্রচারে বিদেশী ব্যাঙ্কের গোপন অ্যাকাউন্টে লুকিয়ে রাখা কালো টাকা ফিরিয়ে আনাকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করে তুলেছিল। একের পর এক বিজেপি নেতা তাঁদের ভাষণে প্রতিশ্রুতি দেন—ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মধ্যেই তাঁরা বিদেশী ব্যাঙ্কগুলো থেকে কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন। বাবা রামদেব এবং বিজেপির আরও কিছু জনমনোরঞ্জনকারী ব্যক্তিত্ব উদ্ভট রকমের অঙ্কের উল্লেখ করে বলছিলেন, কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনলে এক-একজন ভারতবাসী কত করে টাকা পাবে। বিজেপির লিখিত ইস্তাহার অবশ্য নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা বা টাকার কোন পরিমাণের উল্লেখকে এড়িয়ে গিয়েছিল। তবে শপথ গ্রহণের পরপরই প্রথম যে পদক্ষেপটি মোদী নিয়েছিলেন তা ছিল, কালো টাকা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতির প্রতি তাঁর সরকারের দায়বদ্ধতা কতটা তা দেখাতে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন।

এই ব্যাপারে বিশেষ তদন্তকারী দল কতটা এগোতে পেরেছে তা আমরা জানিনা। কিন্তু আমরা এটা জানতে পারছি যে, ক্ষমতায় আসীন হওয়া বিজেপি কালো টাকা উদ্ধার নিয়ে একেবারে ভিন্ন সুর ধরেছে। ঐ দল এখন বলছে, বিদেশে কাদের কালো টাকা সঞ্চিত রয়েছে তাদের নাম প্রকাশের ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি। নামগুলো প্রকাশ হলে কংগ্রেস অস্বস্তিতে পড়বে, সারা দুনিয়াকে একথা জানানোর পর সরকার অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের কাছে তিনটি নাম পেশ করেছে—ডাবর গোষ্ঠীর প্রাক্তন ডাইরেক্টর প্রদীপ বর্মন, রাজকোটস্থিত স্বর্ণ ব্যবসায়ী চিমনাল লোধা এবং খননে যুক্ত গোয়ার কোম্পানি টিম্বলো প্রাইভেট লিমিটেড যার মালিক রাধা এস টিম্বলো। নথি থেকে জানা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টিম্বলোরা বিজেপি এবং কংগ্রেসকে বিপুল টাকা অনুদান দিয়েছে—বিজেপিকে দিয়েছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আর কংগ্রেসকে দিয়েছে ৬৫ লক্ষ টাকা। এই ব্যাপারটা বিজেপির কাছে অস্বস্তির বিষয় হোক বা না হোক, কালো টাকার সঙ্গে বিজেপি অথবা কংগ্রেসেরও গাঁটছড়া নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়ছে।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বেছে বেছে কিছু নাম প্রকাশ করে এবং প্রয়োজনমত সময়ে সীমিত কিছু শোরগোল তুলে বিজেপি কালো টাকার বিষয়টিকে কৌশলবাজির অস্ত্র করে তুলবে। জনগণের দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনকে তাই বিজেপির সংকীর্ণ দলীয় হিসেবনিকেশ থেকে বিষয়টিকে মুক্ত করে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নে সরকারকেই সরাসরি দায়বদ্ধ করতে হবে। গুটিকয়েক বিদেশী ব্যাঙ্কে গুটিকয়েক অ্যাকাউন্টের উপরই সকলের মনোযোগকে বিজেপি আটকে রাখতে চাইলেও প্রকৃত ইস্যুটি কিন্তু অনেক বড়। অবহিত বিশেষজ্ঞরা সঠিকভাবেই বলেছেন যে, অবৈধভাবে বিদেশী ব্যাঙ্কে রাখা টাকা গোটা সমস্যাটার একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এর তুলনায় অনেক বেশী টাকা প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের রূপে 'ঘুরপথে' ভারতে ফিরে আসে। এবং মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত আরও বড় অঙ্কের অর্থ কখনই ভারতের বাইরে যায় না এবং অঘোষিত লেনদেন ও সম্পদের রূপে ভারতেই বাড়তে থাকে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরুণ কুমার যেমন লাগাতার বলে যাচ্ছেন যে, বিষয়টা শুধু কালো টাকার নয়, বরং তা হল বৃহত্তর কালো অর্থনীতির এবং মূল অপরাধী হল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বৃহৎ ব্যবসার মধ্যে গাঁটছড়া যা ঐ কালো অর্থনীতিকে সুরক্ষিত করে।

কালো টাকার সমস্যাটিকে বোঝাবার জন্যে একের পর এক কেন্দ্রীয় সরকার নানা কমিটি ও কমিশন গঠন করেছে। এসত্ত্বেও ঐ সমস্যা ক্রমেই আরও দানবীয় আকার নিয়েছে। ঐ সমস্যার মোকাবিলায় যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলো স্পষ্টতই অকার্যকরী ও এমনকি বিপরীত ফলদায়ী হয়ে দেখা দিয়েছে। মোটের উপর তিনটি ব্যবস্থা দেখা গেছে—(১) স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কালো টাকা ঘোষণাকে উৎসাহিত করার জন্য মার্জনা প্রকল্প, (২) কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কালো টাকা গচ্ছিত রাখার নিরাপদ আশ্রয়গুলো থেকে বিনিয়োগকে বৈধ করে তোলার লক্ষ্যে প্রদত্ত সুবিধা এবং (৩) আইন মানাকে বাড়ানো ও কর ফাঁকিকে কমিয়ে আনার নামে করের হারকে ক্রমেই কমিয়ে আনা। এই সমস্ত পদক্ষেপ কালো টাকার সমস্যার গায়ে কোন আঁচড়ই কাটতে পারনি, সেগুলো দ্রুতহারে ক্রমবর্ধমান কালো অর্থনীতির আরও ফুলেফেঁপে ওঠাকেই অনুকূল করে তুলেছে। মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান থেকে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ এনে ভারতকে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর বড় কেন্দ্রে পরিণত করার কথা বলছেন, কিন্তু আসল তথ্যটা হল, ২০০০ সাল থেকে মরিশাসই ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সবথেকে বড় উৎস হয়ে দেখা দিয়েছে (এখান থেকে এসেছে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের প্রায় ৪০ শতাংশ, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে মাত্র ৬ শতাংশ) এবং এর ব্যাপক অংশই যাচ্ছে অত্যন্ত লাভজনক রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে!

কালো টাকার বিরুদ্ধে কার্যকরীভাবে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ভারতকে একদিকে মরিশাস ও সুইজারল্যাণ্ডের মত কর ফাঁকির নিরাপদ আশ্রয়গুলোর সঙ্গে স্বাক্ষরিত দ্বৈত করবোধ চুক্তিগুলোকে বাতিল করতে এবং বিদেশে নিয়মিতভাবে টাকা পাচারের হাওলা পথকে বন্ধ করতে হবে; এরই পাশাপাশি দেশে কর প্রদান ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রের কর ফাঁকিদারদের উপর কঠোর জরিমানা আরোপ করতে হবে। আর যতদিন বড় শাসক দলগুলো কালো টাকা সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে অনুদান পেতে থাকবে—বিজেপি ও কংগ্রেসকে দেওয়া টিম্বলোদের অনুদানের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে—ততদিন কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো ও তাকে বাজেয়াপ্ত করার কোন রাজনৈতিক সদিচ্ছাও দেখা যাবে না। কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইটাকে তাই অবধারিতভাবেই চালাতে হবে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কাছ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর অনুদান পাওয়ার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে নির্বাচনী সংস্কারের দিকে এবং কর ফাঁকিদাতা, আইন রচনাকারী ও আইন বলবৎকারীদের মধ্যে অসাধু গাঁটছড়াকে চূর্ণ করার দিকে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২৮ অক্টোবর ২০১৪)

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

প্রধানমন্ত্রীকে নরেগা সংক্রান্ত চিঠি উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

ভারতের জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের (নরেগা) পরিণতি সম্পর্কে আমাদের গভীর উদ্বেগের কথা আপনাকে লিখে জানাচ্ছি।

নরেগা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল সমস্ত রাজনৈতিক দলের দিক থেকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে। যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনধারণে প্রান্তিক অবস্থায় রয়েছেন তাদেরকে বহু-প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অন্তত কিছুটা সুরাহা এনে দিতে এটা এক সুদূরপ্রসারী চেষ্টা।

বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, নরেগা তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচে (এক্ষেত্রে চলতি ব্যয় ধরা আছে ভারতের জিডিপি-র ০.৩ শতাংশ), প্রত্যেক বছর নরেগায় কাজ পেয়ে আসছে প্রায় ৫০ মিলিয়ন পরিবার। নরেগা কর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মহিলা, আর অর্ধেকের কাছাকাছি দলিত আদিবাসী। গবেষকদের এক বড় অংশই দেখিয়েছে যে নরেগায় উৎপাদিকা সম্পদ সৃষ্টি সহ সুবিস্তৃত সামাজিক সুফল মিলেছে।

সাম্প্রতিক গবেষণা আরও দেখায় যে দুর্নীতির মাত্রা ক্রমশ কমছে। যেমন, নরেগায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সরকারি মূল্যায়ন দ্বিতীয় সারা ভারত মানব উন্নয়ন সমীক্ষার স্বতন্ত্র মূল্যায়নের খুবই কাছাকাছি। দুর্নীতি যেখানে থাকছে উদ্বেগজনক অবস্থায়, অভিজ্ঞতা দেখায় যে একে আটকানোও যায়। আর নরেগায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতার নতুন মানদণ্ডগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে।

সন্দেহ নেই, কর্মসূচীটি চালানো যায় এবং এমনকি আরও ভালভাবে চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবে সাফল্য যা অর্জিত হয়েছে তা মূলত মোটামুটি এবং এটা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত যে একে সফল করে তুলতে আরও সচেষ্ট হওয়া দরকার।

এই পটভূমির বিপরীতে, এটা শুনে বেশ শঙ্কিত হওয়ার যে আইনটিতে যা সব সংস্থান রয়েছে সেগুলোকে লঘু বা সীমিত করে দেওয়ার বহুবিধ তৎপরতা চলছে। মজুরি প্রকৃত অর্থে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং মজুরি প্রদানে বহু বিলম্ব তার প্রকৃত মূল্য আরও কমিয়ে দিয়েছে। আইনটিতে মজুরি দিতে দেরী হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে প্রাথমিক সংস্থান ছিল সেটা মুছে ফেলা হয়েছে। শ্রম-সামগ্রীর অনুপাত ৬০ঃ৪০ থেকে ৫১ঃ৪৯-তে কমিয়ে আনার কথা বলা হচ্ছে কোনোরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই যে এভাবে নাকি নরেগা কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। এই প্রথমবার, কেন্দ্রীয় সরকার চাহিদার ভিত্তিতে কাজ দেওয়ার মূল নীতির অবমাননা করে রাজ্য সরকারগুলোর ওপর নরেগা খরচ-খরচার বোঝা চাপাচ্ছে।

সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় সরকার নরেগাকে দেশের গরিবতম ২০০টি জেলায় সীমিত রাখার লক্ষ্যে আইনি সংশোধনী নিয়ে আসার কথা ভাবছে। এটা আইনটির মৌলিক প্রেক্ষিতের বিরুদ্ধে যায় ঃ মৌলিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যোগানোর লাভজনক কর্মসংস্থান একটি মানবাধিকার। এমনকি ভারতের তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ জেলাগুলোরও আগামীদিনে বেকারি ও দারিদ্র থেকে মুক্ত হতে পারার সম্ভাবনা নেই।

বার্তাটি দাঁড়ায় যে নতুন সরকার নরেগা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয় এবং আশায় রয়েছে একে যত বেশী সম্ভব সীমিত করে দেওয়ায়। আমরা আপনার কাছে আবেদন করছি যে এই প্রবণতা উল্টে দিন-পাল্টে দিন এবং কর্মসূচীটিকে টিকিয়ে রাখতে ও সমৃদ্ধ করতে যা যা সহায়-সমর্থন প্রয়োজন সেসব সুনিশ্চিত করুন।

আপনার বিনীত

দিলীপ আরু (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি), প্রণব বর্ধন (এমিরেটাস প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে), ভি ভাস্কর (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, ইউজিভার্সিটি অফ টেক্সাস, অস্টিন), অশ্বিনী দেশপাণ্ডে (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, দিল্লী স্কুল অফ ইকোনমিকস), জিয়ান দ্রেজে (ভিজিটিং প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিকস, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়), মৈত্রীশ ঘটক (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, লণ্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস), জয়তী ঘোষ (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, জে এন ইউ), দীপ্তি গোয়েল (এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, দিল্লী স্কুল অফ ইকোনমিকস), হিমাংশু (এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, জে এন ইউ), রজি জয়রামন (এসোসিয়েট প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, ইউরোপিয়ান স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট এ্যাণ্ড টেকনোলজি), কে পি কান্নন (প্রাক্তন ডিরেক্টর, সেন্টার অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ত্রিবান্দম), অনির্বাণ কর (এসোসিয়েট প্রফেসর, দিল্লী স্কুল অফ ইকোনমিকস), বিতিকা খেরা (এসোসিয়েট প্রফেসর, আই আই টি দিল্লী), অশোক কোতোয়াল (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া), এস মহেন্দ্র দেব (ডিরেক্টর, ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ), শ্রীজিৎ মিশ্র (এসোসিয়েট প্রফেসর ইন্দিরা গান্ধী ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ), দিলীপ মুখার্জী (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, বোস্টন ইউনিভার্সিটি) আর নাগারাজ (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ), সুধা নারায়ণন (এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, ইন্দিরা গান্ধী ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ), পুলিন নায়ক (রীডার ইন ইকোনমিকস, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), ভারত রামস্বামী (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট, নিউ দিল্লী), দেবরাজ রায় (প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি), অতুল শর্মা (প্রাক্তন ভি সি, রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি), অভিজিৎ সেন (প্রাক্তন সদস্য, যোজনা কমিশন), ঝিমোল উন্নি (ডিরেক্টর, ইন্সটিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট, আনন্দ), সজাতা ভিসারিয়া (এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অব ইকোনমিকস, হংকং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি), বিজয় ব্যাস (প্রাক্তন সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ)।

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক
''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ২০০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির রাজ্য কাউন্সিল সভা

গত ১৯ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়ায় পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির রাজ্য কাউন্সিল সভা সংগঠিত হয়। এই সভায় সারা ভারত কিষাণ মহাসভার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজারাম সিং ও সহ-সভাপতি কার্তিক পাল উপস্থিত ছিলেন। সভায় কর্পোরেটমুখী আর্থিক নীতির ফলে উদ্ভুত কৃষি সঙ্কট এবং কৃষিজীবী জনগণের জীবন ও জীবিকার ওপর তার প্রভাব নিয়ে চর্চা হয়। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘাত সৃষ্টির যে অপচেষ্টা চলছে তা নিয়েও আলোচনা হয়। সভা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে—অতীতে তেভাগা কৃষক আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে দিয়েছিল, বর্তমানে কৃষি সঙ্কটের বিরুদ্ধে ও কৃষকের জীবন-জীবিকার দাবিতে তীব্র কৃষক আন্দোলনই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ডিজেলের দামের বিনিয়ন্ত্রণের ফলে ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৩.৩৭ টাকা কমে যাওয়া নিয়ে ঢাক পেটাচ্ছে। জনগণকে বোঝাতে চাইছে যে বিনিয়ন্ত্রণের ফলে দাম কমে, কিন্তু আসলে ডিজেলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা বেসরকারি মালিকদের হাতে ও বাজারের ওঠা-পড়ার ওপর ছেড়ে দিল। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, যে কোন সময়েই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার মধ্যে দিয়ে এখানেও ডিজেল ও পেট্রোলের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী হবে।

মোদী সরকারের 'ভারত নির্মাণ করুন'-এর আহ্বান আসলে বিদেশী পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনের জন্য আহ্বান। শিল্পপতিদের স্বার্থে এই সরকার যেমন শ্রম আইন সংশোধন করার চেষ্টা চালাচ্ছে তেমনই জমি অধিগ্রহণকে অনায়াস করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের তৈরী করা জমি অধিগ্রহণ আইনকেও সংশোধন করতে চাইছে। জমি অধিগ্রহণে কৃষকের সম্মতির শতাংশকে কমিয়ে আনা ও ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের প্রশ্নকে লঘু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কৃষি জমি সুরক্ষা আইন চালু করার দাবিতে আমাদের দৃঢ় আন্দোলন চালাতে হবে। বিজেপি সরকারও চাল, ডাল, সরিষা প্রভৃতি বিস্তৃত ক্ষেত্রে জি এম বীজ চালু করার অপচেষ্টা শুরু করেছে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প গুটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১২৪ ব্লকে চালু রাখা এবং দ্রব্যসামগ্রী ও মজুরির অনুপাতের তারতম্য ঘটিয়ে কাজ কমিয়ে আনা ও শেষমেষ এই আইনকে তুলে দেওয়ার প্রয়াস নিচ্ছে। সেচ ব্যবস্থায় সরকারি বিনিয়োগকে ক্রমশ কমিয়ে এনে এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় খাদ্য সুরক্ষায় ভর্তুকির প্রশ্নে ভারত সরকার যে অবস্থান নিয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে মার্কিন সফরে নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের প্রদত্ত ভর্তুকি ক্রমশ তুলে নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উপরোক্ত দাবিগুলোতে তীব্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতিকে গণভিত্তি সম্পন্ন করতে হবে এবং এর বিস্তার ঘটাতে হবে।

পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে কৃষিতে সঙ্কট ক্রমবর্ধমান। কৃষকের আত্মহত্যা অব্যাহত—যদিও রাজ্য সরকার তা স্বীকারই করছে না। গ্রামাঞ্চলে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা ও সামন্ত শক্তি পূর্ণ উদ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকাতলে সামিল হয়ে সরকারের সহযোগিতায় বর্গাদার ও পাট্টাদার উচ্ছেদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষে বর্গাদার ও পাট্টাদাররা কোন নিরাপত্তা পাচ্ছে না। সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক চাষীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল, তাদের জমি পাওয়া এখন কোর্টের ওপর নির্ভর করছে। এখন আবার কোর্টের বাইরে ফয়সালা করার কথা শোনা যাচ্ছে। সেচের উন্নয়নে কোন সরকারি বিনিয়োগ নেই। ''জল ধর জল ভর'' প্রকল্প কথার কথাতেই সীমাবদ্ধ। সারের মূল্যবৃদ্ধি এবং কালোবাজারির ফলে কৃষকের দুর্বিসহ অবস্থা। কৃষকের কাছে সুলভে সার পৌঁছে দেওয়া ও কালোবাজারি রোধ করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। কৃষক মাণ্ডিগুলো বড় পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে কিন্তু আমাদের দাবি প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েতে সরকারি উদ্যোগে সরাসরি চাষীদের থেকে ধান, আলু সহ কৃষি পণ্যের ক্রয়কেন্দ্র করতে হবে। এ দাবিতে কর্ণপাতই করা হচ্ছে না। কৃষি কাজে ব্যবহৃত ডিজেল ও বিদ্যুতে ভর্তুকি দিয়ে সুলভে কৃষককে সরবরাহ করতে হবে। পাঞ্জাব ও অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যুতে ভর্তুকি দিলেও এ রাজ্যে তা করা হচ্ছে না, বরং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে কৃষকেরা অস্বাভাবিক বিল পেমেন্টের প্রাণান্তকর অবস্থায় পড়ছেন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, বাগাড়ম্বর মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে মহাজনী ঋণের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে। গরিব কৃষকরা সহজ শর্তে কৃষি ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়ে মহাজনী ঋণের ফাঁদে পড়ছেন এবং আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন দাবিতে ব্লকে ব্লকে কৃষক আন্দোলনকে তীব্র করতে হবে এবং ব্লক কাঠামোগুলোকে গণভিত্তিসম্পন্ন ও শক্তিশালী করতে হবে। আন্দোলন ও সংগঠন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি সামগ্রিক সত্তা, একটি ব্যতিরেকে অন্যটি শক্তিশালী করা যায় না। কাউন্সিল সভা থেকে যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয় তা হল—(১) ফেব্রুয়ারি ২০১৫-এর মধ্যে সারা রাজ্যে ১ লক্ষ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে। (২) ফেব্রুয়ারি ২০১৫-এর মধ্যে সদস্য সংগ্রহ করে ব্লক সম্মেলন ও জেলা সম্মেলন সম্পন্ন করতে হবে। (৩) জুলাই ২০১৫-এর মধ্যে রাজ্য সম্মেলন করতে হবে এবং (৪) ২০১৫-র অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে।

আলিপুরদুয়ারে পার্টি লিডিং টিম গঠন

৭ জন সদস্যর সমন্বয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা লিডিং টিম গঠন হল বাবুরহাট সি পি আই (এম এল) অফিসে। পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য চঞ্চল দাসকে সর্বসম্মতিক্রমে লিডিং টিমের আহ্বায়ক করা হয়। আগামী ৬ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটির রূপ দিতে নিয়ম অনুযায়ী যা যা করা দরকার তা পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, রাজ্য নেতৃত্ব জয়ন্ত দেশমুখ ও বাসুদেব বোস। ৩৩৮৩ বর্গকিমি ও ১৭ লক্ষ নানা ভাষাভাষি ও সম্প্রদায়ের মানুষের এই নতুন জেলায় ৬টি ব্লক, ৮টি থানা, ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৭০টি চা বাগান, জলদাপাড়া ও বক্সা বাঘ বন, অসংখ্য বনবস্তি, ২টি মিউনিসিপালিটি, ৯টি সেনসাস টাউন, ৫টি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র ও একটি লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্র বর্তমান।

কয়লা ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণে মোদী সরকারের আগ্রাসী উদ্যোগ

কয়লা কেলেঙ্কারির মূলে যে নীতি সক্রিয় ছিল, মোদী জমানায় তার পরিণতি ঘটল ঐ নীতিকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে। নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার হাতে মূল্যবান এই প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছিল—এবং যাতে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মনমোহন সিং-এর দপ্তর যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ—অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে সেই খনিগুলো কোল ইণ্ডিয়ার হাতে ফিরিয়ে না দিয়ে নতুন করে নিলামের এবং তাতে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে মোদী সরকার যেন কয়লা কেলেঙ্কারির কর্পোরেট কুশিলবদের পুনর্বাসনেরই আয়োজন করল। ১৯৯৩ সাল থেকে যে সমস্ত কয়লা খনি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার কিছু রাষ্ট্রীয় সংস্থা সহ বিভিন্ন বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থাকে বণ্টন করেছিল, সুপ্রীম কোর্ট সম্প্রতি ২৪ সেপ্টেম্বর তাদের রায়ে ঐ খনিগুলোর ২১৪টির বণ্টন অবৈধ বলে সেগুলোর লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ দেয়। এই খনিগুলো বণ্টন করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য, খনি থেকে কয়লা তুলে বাজারে বিক্রির অধিকার তাদের ছিল না। বিদ্যুৎ, ইস্পাত, সিমেন্ট ইত্যাদি যে সমস্ত পণ্য উৎপাদনে যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা লাগে এমন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলোকেই ঐ সমস্ত খনি বণ্টন করা হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট যদি তার রায় দানের সঙ্গে-সঙ্গেই লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ দিত সে ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কেননা, বণ্টিত হওয়া সমস্ত খনিতে কয়লা উৎপাদন শুরু না হলেও কিছু খনি থেকে কয়লা তুলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছিল এবং ঐ লাইসেন্স বাতিলের ফলে কয়লা উৎপাদন ব্যাহত হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে ছ-মাসের সময় দিয়ে লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ দেয় ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে। এর মধ্যে নরেন্দ্র মোদী, অরুণ জেটলিরা তাঁদের আরাধ্য নীতিকে, কলঙ্কিত ইউ পি এ সরকারের নীতিকেই বড়-সড় মাত্রায় প্রয়োগের সুযোগ দেখলেন। গত মাসের ২১ তারিখে জারি হল অর্ডিন্যান্স, যা সংসদকে এড়িয়ে তৈরি হওয়া আইন। ঐ অর্ডিন্যান্সের বলে লাইসেন্স বাতিল হওয়া ২১৪টি খনির নিলাম হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। যে সমস্ত কর্পোরেট সংস্থার খনি লাইসেন্স বাতিল হয়েছিল তারাও ঐ নিলামে অংশ নিতে পারবে, অবশ্য তার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এতদিন ধরে তোলা সমস্ত কয়লার জন্য টন প্রতি ২৯৫ টাকা জরিমানা তাদের দিতে হবে। তবে অর্ডিন্যান্স শুধু খনি নিলামের ব্যবস্থা করার মধ্যেই সীমিত থাকেনি, তাতে একটি ধারা যুক্ত করে ভবিষ্যতে কয়লা ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের পথও প্রশস্ত করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় বণ্টিত কয়লাখনির প্রাপকরা খনি থেকে তোলা কয়লা নিজেদের পণ্য উৎপাদনে কাজ লাগানোর পাশাপাশি বাজারে বিক্রির অধিকারও পাবে।

খনি নিলামের জন্য সরকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। এ বছরের ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যে ঐ নিলাম শেষ হবে বলে জানা গেছে। ইউ পি এ সরকার যেখানে 'স্ক্রিনিং কমিটি'র মাধ্যমে তাদের ঘনিষ্ঠ কিছু কর্পোরেট সংস্থাকে কয়লা খনি পাইয়ে দিয়েছিল, মোদী সরকার সেখানে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর হাতে খনি তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে নিলামের মাধ্যমে। কেউ যদি বলেন, এর মধ্যে দিয়ে দেশের, জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত হচ্ছে, কর্পোরেট ক্ষেত্রের প্রতি কোন আনুকূল্য দেখানো হচ্ছে না, তবে তার চেয়ে বড় ভুল আর কিছু হবে না। উদারিকরণ, বেসরকারিকরণের যে নীতি, তাদের বিপুল মুনাফার জন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার যে নীতি ১৯৯১ সাল থেকে ইউ পি এ এবং এন ডি এ নেতৃত্বাধীন সরকারগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করে আসছে, মোদী নিজেও তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বে যে নীতিকে ব্যাপকভাবে গুজরাটে প্রয়োগ করেছেন, মোদী সরকারের অর্ডিন্যান্স সেই লক্ষ্যেই, কর্পোরেটদের প্রতি আনুকূল্য বর্ষণের লক্ষ্যেই এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

বাজারে বিক্রির অনুমতি দানের কথা আপাতত সরিয়ে রেখে শুধু নিজস্ব পণ্য উৎপাদনের জন্য বণ্টিত খনির কথাই যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে তার মধ্যেও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বিপুল মুনাফার সন্ধান পাওয়া যাবে। সি ই এস সি-র কথাই ধরা যাক। সি ই এস সি যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে তাকে কয়লা কিনতে হয় না, সে কয়লা পায় তাকে বণ্টন করা খনি থেকে এবং কোল ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে নিতে হলে যে দামে তাকে কয়লা কিনতে হত নিজস্ব উৎপাদনের ফলে সেই কয়লার দাম অনেক কম পড়ছে। তার উৎপাদিত বিদ্যুৎ সি ই এস সি এলাকায় সরবরাহ করা ছাড়াও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকেও সে কিছুটা বিক্রি করে। এইভাবে সরবরাহ ও বিক্রি উভয় থেকেই সে মুনাফা করে। এই মুনাফার উৎস অতএব অনেকটাই রয়েছে তাকে বণ্টিত কয়লা খনির মধ্যে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইণ্ডিয়ার স্বার্থের বিনিময়ে। মোদী সরকার অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাজারে কয়লা বিক্রির অনুমোদন দেওয়ার যে উদ্যোগ নিচ্ছে, তা কর্পোরেট সংস্থার আরও বেশি মুনাফার, তাদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদের আরও বেশি লুণ্ঠনের সুযোগ করে দেবে।

কয়লা খনি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিলে কয়লা ও বিদ্যুতের দাম বাড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যুৎ এবং তার সঙ্গে অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে যদি কিছু টাকা বেশি দিয়ে নিলামের মাধ্যমে কয়লা খনি কিনতে হয়, অথবা সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এতদিন ধরে তোলা কয়লায় টন প্রতি ২৯৫ টাকা করে জরিমানা দিতে হয়, সেই টাকা কর্পোরেট সংস্থাগুলো কখনই নিজেদের ঘর থেকে দেবে না। বিদ্যুৎ ও উৎপাদিত অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে গ্রাহক ও ক্রেতাদের ঘাড় থেকেই আদায় করে নেবে। এছাড়া, কয়লাখনিতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করবে তাদের নিয়োগও হবে কর্পোরেট অভিপ্রেত পথেই। অধিকাংশ শ্রমিকই নিয়োজিত হবেন ঠিকাদারদের মাধ্যমে, কোল ইণ্ডিয়া শ্রমিকদের যে বেতন দেয়, খনিতে শ্রমিক জোগানোর ঠিকাদারদের কাছ থেকে সেই বেতন শ্রমিকরা কখনই আশা করতে পারবেন না। অতএব, অর্থনীতির বৃদ্ধির কর্পোরেট এজেণ্ডার রূপায়ণে—যে বৃদ্ধি এখন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি রূপেই চিহ্নিত (বৃদ্ধির সবথেকে রমরমা সময়েও, ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ পর্যায়ে অর্থনীতির বৃদ্ধি ৯ শতাংশ হারে হলেও কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.২২ শতাংশ)—কয়লা ক্ষেত্র সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ঘটিয়ে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে বৃদ্ধির যে সার্বিক আয়োজন চলছে, তার মধ্যে বুনিয়াদি জনগণের স্বার্থের সুরক্ষার কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

বিজেপি প্রধানমন্ত্রী মোদী যে কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতায় অকপট তা নিয়ে ভারতে কারুরই কোন সংশয় নেই। তাঁর 'উন্নয়ন' ভাবনা' 'এক ভারত, শক্তিশালী ভারত'-এর ভাবনা অবিমিশ্রভাবেই কর্পোরেট কেন্দ্রীক এবং সেই ভাবনায় জাতীয় স্বার্থ ও কর্পোরেট স্বার্থ একাকার হয়ে রয়েছে। অরুণ জেটলিও বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী থেকে এখন প্রশাসনের নেতা, অর্থমন্ত্রী। তাছাড়া, এবারের লোকসভা নির্বাচনে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর ঢালাও আশীর্বাদে তাঁরা পুষ্ট হয়েছেন। যাঁকে বামপন্থী বলে কেউ অপবাদ দিতে পারবেন না, পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল সেই গোপালকৃষ্ণ গান্ধি পর্যন্ত বলেছেন, ''আমাদের গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছে টাকা'' আর ''তা এসেছে হয় আইনি পথে, কোম্পানিগুলোর বৈধ অনুদানের মধ্যে দিয়ে, আর না হয় বিবিধ উৎস থেকে, অবধারিত ও অপরিহার্যভাবে যার সন্ধান মিলবে খনি, বন এবং জমির মত আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে।'' অতএব, 'খনি, বন এবং জমি' যারা গ্রাস করেছে এবং আরও গ্রাস করতে চায়, তাদের ঋণ শোধ করার দায়ও মোদী, জেটলিদের রয়েছে। অরুণ জেটলি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—''রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা খনির বেসরকারিকরণ এখনই জরুরী'', কেননা উন্নয়নশীল দেশে সরকারকে যাবতীয় সংস্কার ''প্রথম বছরেই'' করে নিতে হবে। কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এবং সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর অর্থনীতির কর্পোরেটমুখী সংস্কারে মোদী সরকার এখন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে-ই মনে হচ্ছে। ইউ পি এ সরকার দীর্ঘদিন ধরে কয়লা ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের চেষ্টা চালিয়ে এসেছে এবং সেই সংক্রান্ত বিল ২০০০ সাল থেকে রাজ্যসভায় ঝুলে রয়েছে। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলোর জোরালো প্রতিবাদের মুখে তাদের সেই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কয়লা ক্ষেত্রকে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর কাছে খুলে দিতে মোদী সরকার সম্ভবত শীতকালীন অধিবেশনে ১৯৯৩ সালের কয়লা খনি জাতীয়করণ আইনের সংশোধনে উদ্যোগী ও আগ্রাসী হবে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর এবং অন্যান্য মেহনতি জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধই হতে পারে ঐ উদ্যোগের একমাত্র প্রত্যুত্তর। **- জয়দীপ মিত্র**

কয়লা খনি বেসরকারিকরণের উদ্যোগের বিরুদ্ধে কয়লা ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়নগুলো প্রতিবাদের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছে। কয়লা ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো ৩১ অক্টোবর রাঁচিতে এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং ২৪ নভেম্বর সমস্ত কয়লা খনিতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। এই ধর্মঘট ছাড়াও মোদী সরকারের জারি করা অর্ডিন্যান্সের ধারাগুলোর এবং কোল ইণ্ডিয়ার ১০ শতাংশ বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সারা দেশে ৫ থেকে ৭ নভেম্বর বিক্ষোভ ও ধর্ণা কর্মসূচী সংগঠিত হবে। রাঁচিতে বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো কেন্দ্রীয় কয়লা সচিবের কাছে একটি চিঠি লেখে যাতে বলা হয়, ''এই অর্ডিন্যান্সের মধ্যে দিয়ে সরকার বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কয়লা খননের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে এবং এর অর্থ হল খোলা বাজারে কয়লা বিক্রি করা। কয়লা শিল্পের শ্রমিকরা সরকারের এই প্রস্তাবনাকে মানতে পারছেন না।'' এ আই সি সি টি ইউ প্রতিবাদের ঐ সমস্ত কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

কর্পোরেট স্বার্থবাহী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা বসিরহাটে

খাগড়াগড় কাণ্ডকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে বিজেপির সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী রাজনীতির প্রতিবাদে সি পি আই (এম এল) উত্তর ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে গণপ্রচার অভিযান শুরু করেছে। গত ৩ নভেম্বর বসিরহাট শহরে প্রচারসভায় পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড পার্থ ঘোষ সমস্ত বাম-গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন, বসিরহাটকে বাংলার মানুষ চেনেন ঐতিহাসিক ''নুরুল ইসলামে''র স্মৃতি হিসাবে, তিতুমীরের জন্মস্থান হিসাবে, সেখান বিশ্বাসঘাতক-দেশদ্রোহী বিজেপির এই অপচেষ্টা মানুষ সফল হতে দেবেন না। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের রাজনীতির কোন জাতি, ধর্ম হয় না। প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাতে হবে। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে কোন একটা সম্প্রদায়কে সন্দেহের তালিকায় আনা আসলে সন্ত্রাস মোকাবিলার সদিচ্ছাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

সভায় পার্টির জেলা সদস্য কমরেড অজয় বসাক বলেন, তৃণমূলের সাড়ে তিন বছরের বন্ধ্যা রাজনীতি এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ও হতাশা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দিচ্ছে। কৃষক-কৃষিমজুর সকলকেই কেন্দ্র-রাজ্য সরকার সংকটে ফেলছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন গণশিল্পী অনুপ (বাবুনি) মজুমদার।

বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির রাজ্যব্যাপী কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ২৮ অক্টোবর বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। প্রায় ৫০ জন আদিবাসী কর্মীদের এক সাইকেল মিছিল বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে ব্লক দপ্তরে সমাবেশিত হয়। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া, বকেয়া মজুরি দীর্ঘদিন ধরে না পাওয়া, বি পি এল কার্ড থেকে প্রকৃত গরিবদের বঞ্চিত করা—এই সমস্ত জরুরী দাবিতে বিক্ষোভ দীর্ঘ সময় ধরে চলে। এছাড়া বার্ধক্য/বিধবা ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার বিভিন্ন উদাহরণগুলো তুলে ধরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বর্তমানে তৃণমূলের জমানায় প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরণের সরকারি সুযোগ-সুবিধার কথা বলছে, কিন্তু একটা ব্লকের সাথে আরেকটা ব্লকের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাতনার বিডিও জানালেন, যে কোন আদিবাসী মানুষ ৬০ বছর পেরিয়ে গেলেই ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, এ জন্য বি পি এল তালিকায় নাম থাকা আবশ্যিক নয়। কিন্তু ১০০ দিনের কাজ বাঁকুড়া জেলা সহ সারা দেশেই সংকুচিত হচ্ছে। ব্লক সূত্রে জানা গেল জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে ১৮টি ব্লকে ১০০ দিনের কাজ হবে। বিক্ষোভ কর্মসূচীর নেতৃত্বে ছিলেন কৃষিমজুর সমিতির জেলা নেতা আনন্দ হেমব্রম, ছাতনা ব্লক সদস্য স্বপন হাঁসদা, রাম বিকাশ বাস্কে, জেলা সি পি আই (এম এল) সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জী।

জমি অধিগ্রহণ আইনকে কার্যত বাতিল করেছে মোদী সরকার

মোদী সরকার তার আস্তিন গুটিয়েছে। নেমে আসছে একের পর এক আক্রমণ। ঢালাও সংস্কারের নামে ইতিমধ্যেই শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। ডিজেলের দামকে বিনিয়ন্ত্রণ, গ্যাসের দাম বাড়ানো, ই-নিলামের মাধ্যমে কয়লা ব্লকগুলোকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া, নবরত্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও এন জি সি-র ৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ৩ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে আর্থিক ঘাটতি পূরণ—হামলা অব্যাহত। আর এবার, জমি অধিগ্রহণ আইনকে সংশোধন করে নতুন কলেবরে শিল্পপতিদের অনুকূলে পেশ করা।

২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি ইউ পি এ (২) সরকার এক বিজ্ঞপ্তি মারফত নতুন জমি অধিগ্রহণ আইন হাজির করে। যার পোশাকি নাম ''**রাইট টু ফেয়ার কম্পেনশেসন অ্যাণ্ড ট্রান্সপারেন্সি ইন্ ল্যাণ্ড অ্যাকুইজেসন, রিহাবিলিটেশন অ্যাণ্ড রিসেটেলমেন্ট (লারর) অ্যাক্ট ২০১৩**''। সেই সময়ে ঐ বিল (তখনও আইন হয়নি) নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও নেতিবাচক দিক নিয়েও সমালোচনা হয়েছিল। এ রাজ্যে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর সহ অন্যান্য রাজ্যে কর্পোরেট ঘরানার স্বার্থে রং-বেরঙের রাজ্য সরকার যেভাবে অবাধে কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে, হাজার হাজার কৃষিজীবী মানুষকে জমি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করেছিল ১৮৯৪ সালের কুখ্যাত ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইনের দৌলতে, তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক গণবিক্ষোভ গড়ে ওঠে। সেই বিক্ষোভকে সামাল দিতেই ইউ পি এ সরকার উক্ত আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। বলাইবাহুল্য, যে ঐ আইনকে তখন প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও সংসদের উভয় কক্ষে সমর্থন করে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করায়। কিন্তু তার কয়েক মাস পরে, দিল্লীর মসনদে ক্ষমতায় আসীন হয় এন ডি এ, আর তারপর থেকেই ঐ আইনকে বদলানোর কথাবার্তা শুরু হয়ে যায় ক্ষমতার অলিন্দে। এমনকি, ২০১৪-র জুন মাসেই, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী রাজ্য সরকারও ইউ পি এ-র আইনকে বিরোধিতা করে কেন্দ্রে বিজেপির সঙ্গে গলা মেলাতে থাকে।

জমি অধিগ্রহণ আইনটি আসার পর থেকেই কর্পোরেট মহল থেকে তীব্র সমালোচনা আসতে থাকে। 'শিল্প বিরোধী', 'বিনিয়োগের পরিপন্থী', 'পরিকাঠামো গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায়', 'পশ্চাদমুখী' প্রভৃতি নানা অভিধায় তা ভূষিত হতে থাকে। তাই ক্ষমতায় আসার মাস খানেকের মধ্যেই এ ব্যাপারে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে ফেলে। প্রথম পদক্ষেপটি ছিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ীর আহূত জুন, ২০১৪-এর বৈঠকে, যেখানে সমস্ত রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঐ বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধনী চাওয়া হয় সরকারিভাবে। এরপর, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রালয় জুলাই মাসের মাঝামাঝি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে একগুচ্ছ সংশোধনী প্রস্তাব হাজির করে বিবেচনার জন্য। উক্ত বৈঠকে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা ছাড়াও, আর যে সমস্ত কংগ্রেস শাসিত রাজ্য খুবই সোচ্চার ছিল আইন সংশোধনের পক্ষে, তারা হল, অসম, কেরল, মণিপুর।

কোন কোন ক্ষেত্রগুলোতে সংশোধনী আসতে চলেছে?

প্রথমেই যে ধারাটিকে লঘু করতে চাইছে বৃহৎ কর্পোরেট ঘরানা তা হল 'কনসেন্ট ক্লজ' বা 'সম্মতি'র ধারাটিকে। **বর্তমান আইনটিতে রয়েছে, বেসরকারি প্রোজেক্টের জন্য অন্তত ৮০ শতাংশ এবং পিপিপি-র জন্য ৭০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছ থেকে আগাম সম্মতি আদায় করতে হবে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে**। বেশ কিছু রাজ্য সরকার (যার মধ্যে পূর্বতন মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোও রয়েছে) তা ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার পক্ষপাতি। কেন্দ্রীয় সরকারও প্রকারান্তরে এই মতের সপক্ষেই ঘাড় নেড়েছে।

দ্বিতীয় ধারাটি হল—সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেস্‌মেন্ট (এস আই এ) বা সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন সম্পর্কিত ধারাটি নিয়ে। বর্তমান আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের পূর্বে গ্রাম সভার অনুমোদন নিতে হবে, অধিগৃহীত জমিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কতটা 'জনস্বার্থে' পরিচালিত এবং তার জন্য প্রকৃতই কত পরিমাণ জমি প্রয়োজন তা নিয়ে স্বচ্ছতার লক্ষ্যে এক পূর্ণাঙ্গ লিখিত বক্তব্য পেশ করতে হবে নির্মাণকারীদের পক্ষ থেকে। এ ব্যাপারে বৃহৎ কর্পোরেট ঘরানাগুলোর ঘোর আপত্তি রয়েছে। **তারা বাধ্যতামূলক শর্তটিকে পুরোপুরি বাতিল অথবা ''কেবলমাত্র বৃহৎ প্রকল্পগুলোর'' জন্যই রাখতে চায়**। ছোট বা মাঝারি মাপের প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে (যদিও তার সংজ্ঞা নিরূপিত নয়) এস আই এ ধারাটির অবলুপ্তি চাইছে।

তৃতীয়ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের যে সংজ্ঞা বর্তমান আইনে রয়েছে, তা আরও সংকীর্ণ করে আনার প্রস্তাব বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলোর রয়েছে। পাশাপাশি, ''**জীবন জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হওয়া''র যে বর্গটি বর্তমান আইনে রয়েছে, তাকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ''জমির মালিক'' শব্দটি রাখার পক্ষপাতি তারা**। ফলে জমির ওপর নির্ভরশীল হাজার হাজার ভূমিহীন গরিব কৃষককে বর্তমান আইন অনুযায়ী পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন (রিসেটেলমেন্ট)-এর ঝক্কি ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আর্থিক দায় থেকেও মুক্ত হবে। এজন্য ''**ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার''এর বর্তমান সংজ্ঞাটাকেই পুরোপুরি বদলে ফেলতে চাইছে তারা**। আর এ প্রশ্নেও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি রয়েছে।

চতুর্থ যে ধারাটিকে বাতিলের পক্ষে বেশ কিছু রাজ্য সরকার ও কর্পোরেটদের ভেতর থেকে আওয়াজ উঠেছে তা হল, 'রেট্রোস্পেক্‌টিভ' ধারা! এই ধারাটির অর্থ হল, অতীতে ১৮৯৪-এর জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী যদি কোন অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে বর্তমানেও বহাল থাকে, তবে এক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হবে যে অতীত আইনের শর্তগুলো এক্ষেত্রে বাতিল হয়ে গেছে এবং বর্তমান আইনের আওতায় তা বিবেচিত হবে। সরকারি মহলে এমন অভিমত রয়েছে যে এর ফলে রাজস্ব খাতে রীতিমতো টান পড়বে। আইনি জটিলতাও বাড়বে। এরই পাশাপাশি বেশ কিছু রাজ্য সরকার জরুরী শর্তটিকে সংশোধন করতে চায়। যে শর্তটিতে বর্তমান আইনে ''বিশেষ ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণের জন্য বিশেষ ক্ষমতা'' প্রদান করেছে। সেই রাজ্য সরকারগুলো চাইছে যে, ধারা ৪০(২)-এ তাদের হাতে এমন কিছু বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হোক যাতে ''আপৎকালীন পরিস্থিতি'' বিচার করে তারা ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

বর্তমান আইনের ৩০(২) ধারা ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের কথা বলেছে। গ্রাম ও শহরের জমির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য। এই আইন অনুযায়ী, জমির তথাকথিত বাজার দরের ১০০ শতাংশ গুণিতকে বাড়ানো হয়েছে (পুরাতন জমি অধিগ্রহণ আইনে যার মূল্য ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ)। এই পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতেও কর্পোরেট একচেটিয়া ঘরানা প্রস্তুত নয়। তাই, কোমর বেঁধে তারা নেমেছে এই আইনের সংশোধনের জন্য।

রাজস্থান সরকারের বিকল্প জমি অধিগ্রহণ বিল

যেহেতু জমি বিষয়টি যুগ্ম তালিকায় সংবিধানের ২৫৪(২) ধারায় অন্তর্ভুক্ত, তাই বর্তমান জমি অধিগ্রহণ আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে আপাদমস্তক বদল করে রাজস্থান সরকার ''রাজস্থান জমি অধিগ্রহণ বিল'', ২০১৪ প্রস্তুত করেছে। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে একবার অনুমোদন পেলে অনেক রাজ্য সরকারই রাজস্থানকে অনুসরণ করার পন্থা অবলম্বন করবে। আর একবার অনুমোদন পেলে তা আবার ১৮৯৪-এর যুগে জমি অধিগ্রহণ আইনকে নিয়ে চলে যাবে। যার ফলে, রাজ্যগুলো যে কোন ধরণের শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে, তা সরকারি হোক বা বেসরকারি, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিকে জবরদস্তি কেড়ে নেওয়ার পুরো স্বাধীনতা পাবে।

রাজস্থান সরকার এস আই এ-কে পুরোপুরি বাতিল করার পক্ষে। ''জনস্বার্থ'' এবং ''পরিকাঠামো''-র শব্দগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার ফলে বিলটিতে সমস্ত ধরণের কার্যকলাপ, এমনকি সেজও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। ''আগামী দিনে জনস্বার্থে কাজে লাগাতে পারে''—এই ধরণের প্রকল্পগুলোকেও ''জনস্বার্থে''র তকমা লাগিয়ে, বেসরকারি সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণের রাস্তা অনেক সহজ করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের আর্থিক পরিমাণকে ৩০ শতাংশে রাখা (যা ১৮৯৪-এর জমি অধিগ্রহণ আইনে রয়েছে), ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বলতে কেবলমাত্র জমি-হারা (অর্থাৎ যাদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছে) এবং পুনর্বাসন ও পুনর্স্থাপন কেবল তাদের করা হবে বলা হয়েছে। এর ফলে জীবন জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হওয়া ব্যাপক ক্ষেতমজুর-ভূমিহীনদের পুরোপুরি বঞ্চিত করা হল।

ইতিমধ্যে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী নির্মলা শীতারামন সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছেন যে **সেজ, বেশ কিছু হাইওয়ে, রেলপথ ও ক্যানালকে জমি অধিগ্রহণ আইনের আওতার বাইরে রাখা হবে** যাতে সহজেই জমি পাওয়া যায়। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, **প্রতিরক্ষা, সাধারণ মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্প এবং বেশ কিছু পরিকাঠামোগত প্রকল্প জমি অধিগ্রহণ আইনের আওতায় আসবে না**।

জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনের চাপে ইউ পি এ সরকার ১৮৯৪-এর আইন বাতিল করে নতুন আইন আনতে বাধ্য হয়। এখন এই আইনকে কার্যত নখদাঁতহীন করে মোদী সরকার আবার কর্পোরেট স্বার্থে জমি অধিগ্রহণকে সুগম করতে নতুন সংশোধনী আনছে। এর বিরুদ্ধে আবার দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলন নতুন চেহারায় আছড়ে পড়তে বাধ্য। আর, হয়তো বা, নরেন্দ্র মোদী তার জন্য হয়ে থাকবেন ইতিহাসের অচেতন শক্তি!

- অতনু চক্রবর্তী

হোক কলরব শুরু হয়েছে যাদবপুরে, (তাকে) যেতেই হবে বহুদূরে

দু'মাস পার হয়ে গিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিগৃহীত হওয়ার পরে, এখনও কারুর শাস্তি হয়নি। যে অস্থায়ী উপাচার্য ছাত্রীটিকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঘটনাটিকে চেপে যাওয়ার জন্য তাঁর পদটি স্থায়ীকরণ হয়েছে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আনুকূল্যে ও সঙ্ঘ পরিবারের রাজনীতিবিদ মহামান্য রাজ্যপালের নির্দেশে। উপাচার্য মহোদয়কে কেউ না মানলেও তিনি আপনি মোড়ল হয়ে তৎকর্তৃক পাইক-বরকন্দাজ ডেকে যারপরনাই পেটানো তাঁর 'সন্তানতুল্য' ছাত্রদের সাথে আলোচনা চাইছেন; অনেকটা জুতো মেরে গরুদানের মাফিক। অবশ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে লটকানো আছে 'রেজিগনেশন, নো নেগোশিয়েশন'। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছাত্রদের দাবির সঙ্গে ঐক্যমত। সর্বস্তরে অনাস্থা থাকা সত্ত্বেও অভিজিতবাবু ক্ষমতার গদীতে আসীন। তৃণমূলের ক্ষমতাশালীরা হাটে-বাজারে, খবরের কাগজে, মিডিয়ায় ও ফেসবুকে রটাতে শুরু করলেন, যাদবপুরের অধিকাংশ ছাত্রীছাত্ররাই নাকি এই আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন অথবা বিরোধী। আদালতে জনৈক নন্দলাল এমনটাই বললেন যে, খুব বেশী হলে মাত্র ২০ শতাংশ ছাত্রীছাত্র উপাচার্যের পদত্যাগ চাইছে, বাকীরা নয়। এসব রটনার ঢাক পিটিয়েই চলেছেন তৃণমূলের পাণ্ডারা। অন্যদিকে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছেন, তাঁর সিংহাসনে বসছেন। শাসকরা ভাবতে শুরু করেছেন হোক কলরবের সমাপ্তি ঘটেছে।

তেমনটা ভাবাই শাসকদের অভ্যেস। তেভাগার শেষের সময়ে তাঁরা ভেবেছিলেন আন্দোলনের শেষ, কিন্তু হাজার মাইল দূরে ঘটে গেল তেলেঙ্গানা। তাঁরা ভেবেছিলেন তেলেঙ্গানা শেষ, কমিউনিস্টরা নির্বিষ হল, এসে পড়ল নকশালবাড়ী। নকশালবাড়ীকে খতম করা হল এই ভাবনার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটল ভোজপুরে। তাই শাসক ভাবে এক, হয় আরেক। উপাচার্যকে স্থায়ীত্ব দিয়ে যাদবপুরকে কব্জা করা যাবে এই প্রচেষ্টাকে ছাত্রীছাত্ররা অবহেলায় নতুন নতুন কৃৎকৌশল হাজির করে কুপোকাৎ করছে। ক্লাসে তাঁরা হাজির হয়ে পড়াশুনা করলেও হাজিরা খাতায় তাঁদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে না, ফলে সরকারিভাবে ক্লাস হচ্ছে তাও বলা যায় না। অন্যদিকে উপাচার্যের পদত্যাগ ও ছাত্রী-নিগ্রহের প্রশ্নে ছাত্রীছাত্রদের মধ্যে

সাতের পাতায় দেখুন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস্ ফ্যাকাল্টির গণভোট থেকে গণরায়

গণভোটে অংশ নেন ৮৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী

উপাচার্যের পদত্যাগের পক্ষে ভোট (২৪৯৭ জন) ৯৬ শতাংশ

১৭ সেপ্টেম্বরের ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের পক্ষে ভোট (২৫৫৩ জন) ৯৮ শতাংশ

২৮ আগস্টের ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের পক্ষে ভোট (২৫২৭ জন) ৯৭ শতাংশ

নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি সহ আই সি সি-র পুনর্গঠনের পক্ষে ভোট (২৫১৭) ৯৭ শতাংশ

ক্যাম্পাসে চলমান নজরদারির বিরুদ্ধে ভোট (২৩৫৯ জন) ৯১ শতাংশ

বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির গণভোট হবে ১১, ১২ নভেম্বর **- তথ্য সংকলনে ঃ কস্তুরি**

মুখ ঘোরাচ্ছে তৃণমূল পরের পরীক্ষা পৌর নির্বাচন

তৃণমূলের মাথায় ঘুরছে পুরভোট এগিয়ে নিয়ে আসার চিন্তা। ২০১৫-র রাজ্য বাজেটের বেশ কিছু সময় আগেই সেরে ফেলতে চাইছে। কারণ মানুষের মন যাচাইয়ের ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে। হাওয়া ঘুরছে প্রতিকূলে। যেমন, কলকাতা কর্পোরেশন এলাকাতেও সেই তথ্যচিত্র ধরা পড়ছে। গত লোকসভা ভোটের ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফলের নিরীখে কলকাতায় তৃণমূল পিছিয়ে রয়েছে ৩৭টি ওয়ার্ডে। অধিকন্তু গড় ভোটও কমেছে। এই ফলাফল গত মে মাসের। তারপর থেকে শাসকদলকে কেন্দ্র করে জনমতের বিরূপতার জল আরও গড়িয়েছে। পরের পর যত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, একটা ক্ষেত্রেও তার সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারেনি। যে সরকারটা এসেছিল বহু প্রতিশ্রুতিগুচ্ছ বিলিয়ে, আন্তরিকতার সাতকাহন শুনিয়ে, সময়ের সাথে সাথে কিছু মোহ তৈরী করতে যেমন পেরেছিল, তারপরে তার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও অপদার্থতাও ধরা পড়তে শুরু করেছে। আর তা নিয়ে প্রশ্ন বা অসন্তোষ প্রকাশ হলে তার শাসক প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছে দমিয়ে দেওয়ার পন্থায়।

রাজ্যে ২০১১-র জমানা বদলের পর থেকে উপর্যুপরি যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে তার নির্যাসটা রয়েছে গণতন্ত্র আর উন্নয়নকে কেন্দ্র করে। আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে, গণতন্ত্রের ভিত্তিতে উন্নয়নকে কেন্দ্র করে। আর এখানেই মানুষ প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছে। মানুষের এই প্রতিক্রিয়াকে চলচ্চিত্র উৎসব, গান মেলা, সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি দেখিয়ে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না।

গণতন্ত্রের বদলে কায়েম হয়েছে দলতন্ত্র, দমনতন্ত্র। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার প্রায় শুরু থেকেই একটার পর একটা গণতন্ত্র হরণের-দমনের ঘটনা ঘটে আসছে। এটা পরিঘটনাই হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গচিত্র আঁকা, নারী ধর্ষণ, ধর্মঘট-বনধ্, প্রতিবাদী সভা-সমাবেশ, কিংবা শিল্প-সংস্কৃতি প্রদর্শন-পরিবেশন করতে গিয়ে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মিলেছে কুৎসা, নয়তো অবিচার, আক্রোশ, আক্রমণ। বিগতকালের আধ ডজন গণহত্যার তদন্ত কমিশনের প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শয়ে শয়ে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি মেলেনি। তারা জেলে পচছে বিনা বিচারে। এই আমলেও রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। উপরন্তু বাড়ছে সন্ত্রাসের 'আরাবুল, মনিরুল, অনুব্রত' চেহারা; যা নেত্রী, মন্ত্রী, নেতা, মাথাদের যথেচ্ছ মদত পেয়ে আসছে, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও নেপথ্যে।

দ্বিতীয়ত, জনমুখী উন্নয়নের প্রশ্নে এই সরকার যে একটা সমাজকল্যাণ নীতি নিয়ে চলছে তার কোনও রেখাপাত নেই। 'উন্নয়নেব' নামে যা চলছে সবই পরিকল্পনাবিহীন খাপছাড়া খেয়ালখুশীমত ছক কষে। অথবা নিতান্তই যেক্ষেত্রে বাধ্য হতে হচ্ছে বা সুবিধাজনক মনে হচ্ছে ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবে সেইমতো 'উন্নয়নেব' প্যাকেজ ছিটেফোঁটা বিলানো হচ্ছে। কোনও নীতির বালাই নেই। স্থায়ী উন্নয়ন কিভাবে আসছে তার কোন আভাসই নেই। কৃষি, কৃষক, কৃষিমজুরদের জরুরী বিষয়গুলো প্রচণ্ডভাবেই অবহেলিত থাকছে। শিল্প আর কর্মসংস্থানের তথ্যচিত্রও আলাদা কিছু নয়। একটা কারখানা খোলে তো দশটা বন্ধ হচ্ছে, সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ। শ্রমিকদের পি এফ, গ্র্যাচুইটির টাকা মালিকরা আত্মসাৎ করছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিছু সরকারি হাসপাতালে সুলভ মূল্যে 'জেনরিক ওষুধ'-এর কাউন্টার খোলা হয়েছে এবং জেলা স্তর পর্যন্ত চিকিৎসা মিলবে বিনা মূল্যে বলে এই সেদিন ঘোষণা করা হল। কিন্তু সামগ্রিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন কোথায়? অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প চালু হয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষকপদ বহু সংখ্যায় শূন্য থাকছে, ক্লাস ড্রপ এক সর্বব্যাপী চিত্র। পৌর করকাঠামো, পৌর স্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক হিসাব-কিতাবে অস্বচ্ছতা তথা দুর্নীতি নিয়ে অসন্তোষ সর্বত্র। খাস কলকাতার কথায় এসে পড়ছে সর্বোপরি সাদাবাতি লাগানোর টেন্ডার দেওয়া থেকে শুরু করে লেকমার্কেট শপিং মল কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ।

শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সাথে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রতারণায়ও জড়িত হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। সারদা প্রতারণা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক প্রতারণাও দৃশ্যমান তথ্যপ্রমাণ। সারদা মালিকের সাথে রাজ্যের শাসক মালিকদলের লেনাদেনার তথ্যপ্রমাণ যা ফাঁস হয়ে গেছে তাতে তৃণমূলের সারদা কলঙ্ক মুছে ওঠা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। প্রথম চোটেই মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করেছিলেন মাছি মারার মতো আক্রমণাত্মক হতে। কিন্তু ঘটনাবলীর প্রকাশে অচিরেই মালুম পেতে থাকলেন দল দুলছে ধরা পড়া-না পড়ার দুনৌকায়। নেত্রীর নামও জড়িয়ে গেছে সারদা মালিকের সাথে রোজভ্যালি মালিকের উপস্থিতিতে কালিম্পং-এর ডেলোয় গোপন বৈঠক করা, আর কলকাতায় টাউন হলে ছবি বেচা-কেনার কেলঙ্কারির সাথে। সেইসঙ্গে জড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে পুরানো দুই পার্শ্বচর ডাকাবুকো নেতার নাম—বিভিন্ন তথ্যসূত্রে। সি বি আই সারদা মামলায় প্রথম চার্জশীট দিয়েছে। তাতে তৃণমূলের একদা পরম পোষিত এক জনপ্রতিনিধি অভিযুক্ত, তৃণমূলের সদস্যপদ পাওয়া এক প্রাক্তন কুখ্যাত পুলিশ অফিসার এই মামলা কারারুদ্ধ। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ অনেক 'সুধীজন'দের জেরায় ডাক পড়ছে। যে দুই ডাকসাইটে নেতা সন্দেহের তালিকায় তাদের অনুচরদের জেরার কবলে পড়তে হচ্ছে। এখন সি বি আই এই মামলায় তৃণমূলকে কতখানি কাত করবে তা ঐ কেন্দ্রীয় সংস্থার ব্যাপার। কিন্তু জনমনে তৃণমূল সম্পর্কে যে কেচ্ছার ছাপ পড়েছে তা নিয়ে তৃণমূল উভয় সংকটে। ভাবছে কুণাল-আরাবুলদের ছেঁটে ফেলার মধ্য দিয়ে ভাবমূর্তি ফিরে পাওয়ার। কিন্তু মানুষের সামনে হাজির করতে পারছে না কোন বিশ্বাসযোগ্য বক্তব্য। সব মিলে অনেকটাই রক্ষণাত্মক জায়গায় পড়ে যেতে হয়েছে। দলের সামাজিক ভিত্তিতে নামছে কম-বেশী ধ্বস। প্রতিকূলতা ধেয়ে আসছে যখন ক্রমশ জোরালো হয়ে তখন একবার ঘুরে দাঁড়াতে মরীয়া হওয়া যাক। এভাবেই হঠাৎ ভাবনায় পেয়ে বসল তৃণমূলনেত্রীকে। নেত্রীর ভাবনাই দলের ভাবনা, আর সেই ভাবনা মতই সারদার কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলার দিবাস্বপ্ন দেখা থেকে হোক মুখ্যমন্ত্রী-নেত্রীর ভাইপো সাংসদকে আরও ক্ষমতাবান করার উদ্দেশ্যে হোক, কদিন আগেই নেত্রীর ইচ্ছায় দলের আভ্যন্তরীণ কোর-নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমতার যে ডানা ছাঁটা-জোড়ার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল, অনতিবিলম্বেই আবার মনে করা হল সামনে যখন পৌর নির্বাচন তখন সদ্য গৃহীত পদক্ষেপ ব্যুমেরাং হতে পারে। কারণ, যদিও দলে সর্বোচ্চ ক্ষমতা নেত্রীর প্রতি সমর্পিত,তবু আবার নেত্রীর পার্শ্বচর হরেক নেতাদের পরস্পরকে টেক্কা দিতে একাধিক গোষ্ঠী কর্তৃত্ব গজিয়ে ওঠার অনিবার্যতাও লক্ষণীয়। আর সেক্ষেত্রে দলের সাধারণ সম্পাদকের গোষ্ঠী কর্তৃত্বের জোর যে স্তরে পৌঁছেছে, তাতে তাকে বর্তমানে তৃণমূল নেত্রীর মনের দিক থেকে যদি অপছন্দ লাগা শুরু হয়েও থাকে, বিকল্প পূরণের তেমন তাস নেই, তাই সাংগঠনিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে অগত্যা কিছুটা পুনর্মুষিকভব পদক্ষেপই তৃণমূলনেত্রীকে নিতে হল। শুধু তাই নয়, নেত্রী নিজেকে ও দলকে 'সাধু' সাজিয়ে রাখতে সারদা প্রতারণার সাথে সারদা কেলেংকারিব সাথে জড়িয়ে যে দুই নেতার সাথে সুপরিকল্পিত দূরত্ব রেখে চলছিলেন, তাদের প্রতি আবার নৈকট্যের বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তারা মিডিয়ার 'চক্রান্তমূলক প্রচারের (লক্ষ্য করুন, কোনও প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির নাম এ যাত্রায় নেওয়া হচ্ছে না) শিকার' বলে নেত্রী প্রতি-আক্রমণাত্মক আস্ফালন প্রদর্শনে ফিরে আসতে চাইছেন। কিন্তু এতে বিশেষ সুবিধা মেলার নয়। যে প্রতারণার কলঙ্কের দাগ জনমনে লেগে গেছে তা আর তুলে ফেলার নয়। সেটা সম্ভব নয় বুঝেই জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছেন। তারই অবতারণাস্বরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চাইছেন 'উন্নয়নে' তথাকথিত সাফল্য প্রচারের তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরার অস্ত্রে।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও বহু প্রশ্ন রয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যেমন, ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের এরাজ্যে পুর ও নগরোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত অনুদান খাতে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ ছিল ৫৯১৯ কোটি টাকা, আর কেন্দ্র বরাদ্দ করেছিল ৪২০২ কোটি টাকা; কিন্তু গত জুলাই ('১৪) মাস পর্যন্ত মমতা সরকার খরচ করেছে মাত্র ২২৩২ কোটি টাকা, খরচ করেনি ১৯৭০ কোটি টাকা। কি নিদারুণ অবহেলা। তবে গেরুয়া পার্টির ফায়দা তোলার গলাবাজী করার নৈতিক অধিকার নেই। কারণ, অর্থ কমিশনের যা সুপারিশ ছিল তা থেকে মোদী সরকার ১৭১৭ কোটি টাকা ছেঁটে দিয়েছে। বিজেপি সরকারও করেছে বঞ্চনা,তৃণমূল সরকারও করেছে বঞ্চনা।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

নিখিল ভারত যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলনে আলোচনাসভায় বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব

নিখিল ভারত যুব ফেডারেশন (সি পি আই প্রভাবিত যুব সংগঠন) তাদের সাম্প্রতিক রাজ্য সম্মেলন চলাকালীন এক বিশেষ অধিবেশনে বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন বামপন্থী যুব সংগঠনের নেতৃত্বকে এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ২ নভেম্বর হাওড়ার শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাসভায় বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অপূর্ব ঘোষ এবং রাজ্য সভাপতি সৌভিক ঘোষাল। আলোচনাসভার বিষয় ছিল ''পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বেকারদের কাজের দাবি'' এবং ''বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামপন্থার প্রাসঙ্গিকতাকে সোচ্চার করা''য় যুবদের ভূমিকার মতো দিকগুলো। আয়োজক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক তাপস সিনহা আলোচনাসভায় জানান বামফ্রন্টের বাইরে থাকা যুব সংগঠনগুলোকে এবার আহ্বান জানানোর বিশেষ প্রয়োজনিয়তা তারা অনুভব করেছেন। আর ওয়াই এফ (আর এস পি প্রভাবিত যুব সংগঠন)-এর নেতৃত্ব ক্ষমতার বাইরে আন্দোলন সংগ্রামের ময়দানে থাকা বামপন্থীদের কাছ থেকে ক্ষমতার মসনদে থাকা বামপন্থীদের শেখার বিভিন্ন দিকগুলোর ওপর জোর দেন। বামফ্রন্টভুক্ত বিভিন্ন যুব সংগঠনগুলোর নেতৃত্বও ঐক্যবদ্ধ বাম যুব আন্দোলনকে সময়ের দাবি ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেন। বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি সৌভিক ঘোষাল তাঁর বক্তব্যে এ রাজ্যে যুব আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রত্যাবর্তন জরুরী বলে মত প্রকাশ করেন। সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন 'বামপন্থী' যুব সংগঠন যেভাবে বুনিয়াদী শ্রেণীর ও বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পুঁজির পক্ষে ওকালতি করেছে, তার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন ও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন ব্যক্ত করেন। বামপন্থী যুব আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই কর্মসংস্থান ও সেইজন্য ব্যাপক শিল্পায়ন চায়, কিন্তু সেই শিল্পায়নের চরিত্র কেমন হবে সেই নিয়ে স্পষ্ট ধারণা ও তার প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেন। বুনিয়াদী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমনিবিড় শিল্পের স্থাপনা ও শিল্পায়নের শাসক শ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া মডেলটির বিরোধিতার ওপর জোর দেন। গোটা দেশের মত এ রাজ্যেও বিজেপির সাম্প্রদায়িক-কর্পোরেট রাজনীতি বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমের হাত ধরে তার প্রভাব বাড়িয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। ঐক্যবদ্ধ বাম যুব আন্দোলনকে তার সর্বশক্তি ও সৃজনশীলতা নিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলায় বামপন্থীরা বিশেষভাবে আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন আর এই দেশ বা রাজ্যেও তা না হওয়ার কোনও কারণ নেই—এই বিশ্বাসে স্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে যুব আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর, প্রয়োজন আছে ঐক্যবদ্ধ বাম যুব আন্দোলনের—একথা বলে বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের এই ধরণের একটি আলোচনা সভার আয়োজনের জন্য তিনি ধন্যবাদ দেন। অন্যান্য বিভিন্ন বামপন্থী যুব সংগঠনের নেতৃত্বও সময়ের সংকটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ঐক্যবদ্ধ বাম যুব আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ, আলাপ আলোচনার প্রস্তাব রাখেন।

● কেন্দ্রের মোদী সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে
● রাজ্য সরকারের উদাসীনতা ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে

৮ ডিসেম্বর শ্রমিক সমাবেশ
ও শ্রমমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

জমায়েত ঃ রাণী রাসমণি রোড, ধর্মতলা, কলকাতা ঃ দুপুর-১টা
এ আই সি সি টি ইউ

দিল্লীতে পোশাক তৈরির কারখানায় শ্রমিক সংগ্রাম চলছে

আইন তাঁদের যে অধিকার দিয়েছে, পরিচালন কর্তৃপক্ষের সেগুলো ক্রমাগত লঙ্ঘন করে চলার বিরুদ্ধে দিল্লীর জাহাঙ্গীরপুরির এস এম এ শিল্পতালুকে অবস্থিত মঙ্গলা অ্যাপারেল কারখানার শ্রমিকরা এ বছরের জুলাই মাস থেকে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত লড়াই চালিয়ে আসছেন। ই এস আই প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়ায় অমর নামে এক শ্রমিক মারা যাওয়ার পর এই লড়াই শুরু হয়। কারখানা পরিচালনা কর্তৃপক্ষ ই এস আই কার্ড দেওয়ার আগেই ঐ কার্ড পেয়েছে বলে বেআইনিভাবে সাদা কাগজে শ্রমিকদের দিয়ে সই করিয়ে নিচ্ছিলেন। অমর সাদা কাগজে সই করতে রাজি না হলে তাঁকে ই এস আই কার্ড দেওয়া হয় না এবং তিনি ই এস আই-এর মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

এ বছরের সেপ্টেম্বরে ইউনিয়ন গড়ে ওঠার পর থেকেই কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সংগ্রামকে খর্ব করে তুলতে সমস্ত ধরনের কৌশলেরই আশ্রয় নিচ্ছেন। প্রথমত, ইউনিয়নের সম্পাদক অজয় সিংকে ছাঁটাই করার উদ্দেশে ওরা ৮ অক্টোবর অজয় সিং-এর সঙ্গে হাতাহাতির কথা 'বানালো'। স্থানীয় মহেন্দ্র পার্ক থানাও কর্তৃপক্ষকে মদত দিতে অজয় সিংকে গ্রেপ্তার করতে এল। কিন্তু এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শতাধিক শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দিয়ে অজয় সিংকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থানায় গেলেন এবং এইভাবে ওদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। কর্তৃপক্ষ 'বিভাগীয় তদন্ত' শেষ না হওয়া পর্যন্ত অজয় সিংকে সাসপেণ্ড করে ওকে ছাঁটাই করার ফন্দি আঁটল। এর আগে পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অমরের 'চরম অবহেলার কারণে মৃত্যু' হওয়া জনিত এফ আই আর নিতে চায়নি। এবং ঘটনার যথাযথ তদন্ত না করেই কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করেছিল। এবারও পুলিশ অভিযোগ সম্পর্কিত রিপোর্ট রোহিনি কোর্টে জমা না দিয়ে কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রের পক্ষেই দাঁড়াল।

পোশাক কারখানায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে শ্রমিকদের ভয় দেখানো ও তাদের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হল। কারখানা কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি সন্তোষ শাকে বরখাস্ত করল এবং সহ-সভাপতি পীতাম্বরকে সাসপেণ্ড করল, উদ্দেশ্য ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দেওয়া ও শ্রমিকদের আন্দোলনকে দমন করা। শ্রমিকরা কিন্তু চাপের মুখে নত না হয়ে ইউনিয়ন গঠনের অধিকারকে রক্ষা করতে লাগলেন। এর ফলে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কিছু দাবিকে মানতে বাধ্য হলেন। অনেক শ্রমিককেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা দেওয়া হল, সমস্ত শ্রমিককে বিধিবদ্ধ ন্যূনতম বোনাস দিতে এবং সুপারভাইজার ও তার চেয়ে উঁচু পদাধিকারীদের আরও বেশি হারে বোনাস দিতে রাজি হল।

মঙ্গলা পোশাক কারখানায় পরিস্থিতি এখনও উত্তেজনাপ্রবণ রয়েছে, কেননা কর্তৃপক্ষ একই সাথে সুবিধা দেওয়া ও ভয় দেখানোর কৌশল নিয়ে ইউনিয়নের কার্যকলাপকে বানচাল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁরা শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে দাবি তোলা শ্রমিকদের উপর হুমকিকে বাড়িয়ে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলা পোশাক কারখানার শ্রমিক ইউনিয়ন শ্রম দপ্তরের কাছে গিয়ে শ্রম আইন ভঙ্গের জন্য 'সাধারণ তদন্ত'র আবেদন জানান। এ আই সি সি টি ইউ বিষয়টি নিয়ে লেগে থাকে এবং অবশেষে ১৫ অক্টোবর ঐ তদন্ত হয়। প্রত্যাশিতভাবেই 'শ্রম পরিদর্শকরা' তাঁদের পরিদর্শনের সময় ১৩০ জন শ্রমিককে তাঁদের তদন্তের আওতায় নেননি এবং শ্রম আইন ভাঙ্গার কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখও করেননি।

এরপর এ আই সি সি টি ইউ নেতৃবৃন্দ ২৭ অক্টোবর শ্রম দপ্তরের জয়েন্ট কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন, পরিদর্শকদের করা ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান এবং দু-দিনের যে নথি কারখানা কর্তৃপক্ষ পরিদর্শকদের দেখাননি তা পরীক্ষা করার জন্য পরিদর্শকদের আবার কারখানায় পাঠানোর দাবি জানান। এ আই সি সি টি ইউ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জয়েন্ট কমিশনারের উত্তপ্ত বাদানুবাদ চলে। জয়েন্ট কমিশনার যে যুক্তি দেন তার থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে—'পরিদর্শক রাজ' জমানার অবসানে যে ব্যাপক 'শ্রম আইন সংস্কার' হতে চলেছে এবং যা মোদীর 'ভারতে নির্মাণ করুন' পরিকল্পনাকে সফল করে তুলবে, তার পক্ষেই তাঁকে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, পরিদর্শকদের আবার কারখানায় পাঠালে তাঁর চাকরি চলে যাবে। কিন্তু এ আই সি সি টি ইউ-র প্রতিনিধিরা নাছোড়ভাবে লেগে থাকায় তিনি শুধু এই অনুমতিটুকু দেন যে—ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা শ্রম দপ্তরের পরিদর্শকের ফাইল দেখে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে পারবে এবং পরিদর্শনের সময় যে সমস্ত শ্রমিকদের নথি দেখা হয়নি তাদের নামও লিখিতভাবে জানাতে হবে। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার রক্ষায় অবিচল রয়েছেন এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এস এম এ শিল্পতালুকের সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিষয়টি প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীর স্মরণসভা

প্রয়াত জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল ২৯ অক্টোবর শহরের বান্ধব নাট্য সমাজ মঞ্চে। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল, রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার, জয়তু দেশমুখ সহ পার্টির রাজ্য কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। প্রয়াত কমরেডের স্ত্রী, কন্যা, জামাতা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে।

স্মরণসভা যৌথভাবে পরিচালনা করেন পার্টির রাজ্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য বাসুদেব বসু, জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক সুভাষ দত্ত, জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য বিজন সরকার, রাজ্য কমিটি সদস্য চঞ্চল দাস ও জেলা কমিটি সদস্য প্রদীপ গোস্বামী।

কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পার্টির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিটির, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি, পরিবারের পক্ষ থেকে স্ত্রী রীণা চক্রবর্তী, কন্যা স্পন্দিতা চক্রবর্তী, দাদা অমল চক্রবর্তী ও বৌদি প্রতীমা চক্রবর্তী। মাল্যদান করেন চা-বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়ন সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক চিত্ত দে, সমাজবাদী জনপরিষদের পক্ষে কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জী, সিটুর পক্ষে কৃষ্ণ সেন, আর এস পি-র পক্ষে প্রকাশ রায়, সি পি আই-এর পক্ষে রণগোপাল ভট্টাচার্য, এস ইউ সি আই-এর পক্ষে বিনয় বসু, পি সি সি, সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষে অমল রায়, সি পি আই (এম এল) (কানু সান্যাল গোষ্ঠী)-এর পক্ষ থেকে বৃন্দাবন বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এরপর প্রয়াত কমরেডের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নীরবতা পালন করা হয়। মীরা চতুর্বেদীর মর্মস্পর্শী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার মূল পর্ব শুরু হয়।

স্মরণসভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কার্তিক পাল, জয়তু দেশমুখ, গৌরী দে, বাবুন দে, পুলক গাঙ্গুলী প্রমুখ পার্টির নেতৃবৃন্দ। পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বৌদি প্রতিমা চক্রবর্তী ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দাদা অমল চক্রবর্তী।

সেইসঙ্গে বক্তব্য রাখেন সমবেত অন্যান্য বাম নেতৃবৃন্দ।

শহরের বিভিন্ন স্তরের নাগরিক এই স্মরণসভায় যোগদান করেন এবং প্রয়াত জেলা সম্পাদকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন। দু শতাধিক পার্টি সদস্য সহ বহু গুণমুগ্ধ অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন।

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা প্রয়াত জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানাতে ৩১ অক্টোবর আলিপুরদুয়ারের ১ নং ব্লকের বাবুরহাটে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। আলিপুরদুয়ার এরিয়া কমিটি এলাকার শোকাহত নেতৃত্ব, কর্মী, সমর্থক ও বন্ধুরা সভায় উপস্থিত থেকে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রয়াত সাথীর স্মৃতিচারণ এবং তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর কমিউনিস্ট সুলভ আচরণ এবং পার্টির প্রতি তার একনিষ্ঠ কর্তব্য এবং ভূমিকা উত্তরসূরীদের কাছে প্রেরণা হয়ে থাকবে।

... যেতেই হবে বহুদূরে

পাঁচের পাতার পর

গণভোট নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কেবল কলাবিভাগের যে ভোট তাতে মোট ছাত্রীছাত্রের ৮৭ শতাংশ ভোটে অংশগ্রহণ করেছে আর তাদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ, অর্থাৎ সামগ্রিকের ৮৪ শতাংশের বেশী উপাচার্যের পদত্যাগ চেয়েছে। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় টিচারস অ্যাসোসিয়েশন (জুটা) সমবেতভাবে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছে। অর্থাৎ উপাচার্যকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেউই চান না। যদি মেরুদণ্ড থাকা কোন উপাচার্য হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই পদত্যাগ করতেন। তবে বর্তমান স্থায়ী উপাচার্যের তেমনটা আছে বলা যাবে না বোধহয়। ফলত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদিন এই উপাচার্য থাকবেন ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে অশান্তি বজায় থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

''হোক কলরব'' আন্দোলন গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে আর কেবল যাদবপুরের আন্দোলন নয়। তার ব্যাপ্তি ঘটেছে সারা দেশজুড়ে, এমনকি বিদেশেও তার আঁচ পড়েছে। সারা রাজ্যে তথা দেশেই লিঙ্গসাম্য ও লিঙ্গন্যায়ের বিষয়টি স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। তাই ছাত্রী নিগ্রহের বিচারে উপাচার্যের অনীহা প্রথমেই আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলে। পরে উপাচার্যের আহ্বানে ছাত্রীছাত্রদের উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ঢুকে নজিরবিহীন পুলিশি আক্রমণ নির্দিষ্টভাবে ক্যাম্পাস গণতন্ত্র ও সাধারণভাবে রাজ্যে গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক দশক ধরেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুলিশী সহযোগিতায় শাসকদলের ছাত্র সংগঠনগুলোর মাতব্বর দাদারা কোন গণতান্ত্রিক পরিবেশই বজায় রাখতে দেয়নি। তদুপরি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে আঁতাত করে শাসকের গুণ্ডাবাহিনী মানুষের কণ্ঠরোধ করেছে। এই অবস্থায় যাদবপুরের আন্দোলন সারা রাজ্যের মানুষকে ভাষা জুগিয়েছে, সাহস সঞ্চার করেছে। তাই ২০ সেপ্টেম্বর সেই বিশাল মিছিলে মিলেছে জনতা। এরকম পরিস্থিতিতে চাইলেও কর্তৃপক্ষ শাসকেরা যাদবপুরের ছাত্রীছাত্রদের ''হোক কলরব'' থামাতে পারবে না। প্রতিদিন ''হোক কলরব''-এর সমর্থনে প্রতিবাদী সমাবেশ হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। তাই ''হোক কলরব'' শুরু হয়েছে যাদবপুরে (তাকে) যেতেই হবে বহুদূরে।

- অমিত দাশগুপ্ত

অনিবার্য কারণবশতঃ 'বীর' সাভারকর, সঙ্ঘ পরিবার ঃ কিছু তথ্য, কিছু কথা—শীর্ষক রচনার শেষাংশ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক।

লেখা-রিপোর্ট-প্রতিবেদন-ছবি
সবকিছু পাঠান ই-মেইলের মাধ্যমে
e-mail : deshabrati@gmail.com

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
''লিবারেশন''
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

টাড়ায় বন্দী থাকা প্রয়াত কমরেড শাহাচাঁদজী অমর রহে!

গত ২ নভেম্বর বন্দী অবস্থায় প্রয়াত হলেন বিহারের জাহানাবাদ-আরোয়ালের জনপ্রিয় পার্টি নেতা কমরেড শাহাচাঁদজী। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭২ বছর। সম্প্রতি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে গয়া জেল থেকে পাটনা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং পাটনা মেডিক্যাল কলেজে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

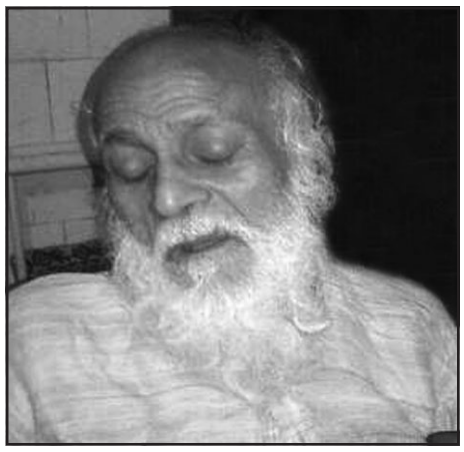

শাহাচাঁদজী বিহারের পুরানো পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় মুখিয়া তথা গ্রাম প্রধান রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং নিঃস্বার্থভাবে গ্রামীণ সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং এর ফলে প্রশাসন তাঁকে সমগ্র গয়া জোনের মডেল মুখিয়া রূপে নির্বাচিত করতে বাধ্য হয়েছিল। জাহানাবাদ অঞ্চলে তিনি ''চাঁদ মুখিয়া'' নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

'৮০-র দশকে আরোয়াল গণহত্যা এবং তার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রতিরোধ কমরেড শাহাচাঁদজীকে জাহানাবাদের বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তিনি আই পি এফে যোগ দেন। ধাপে ধাপে তিনি সি পি আই (এম এল) সংগঠনে যোগ দেন এবং জাহানাবাদ-আরোয়ালের একজন নির্ভরযোগ্য পার্টি নেতা রূপে এগিয়ে আসেন।

'৯০-এর দশকে তিনি আরওয়াল বিধানসভা আসনে আই পি এফের প্রার্থী রূপে সামন্ত শক্তির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। কার্যত সামন্ত তথা মাফিয়া শক্তি ভোট গণনা কেন্দ্রে রিগিং করে তাঁকে অল্প কিছু ভোটে পরাজিত করে।

২০০১ সালে টাড়ায় অভিযুক্ত জাহানাবাদ-আরোয়ালের যে ১৪ জন কমরেডকে আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে তার মধ্যে কমরেড শাহাচাঁদজী ছিলেন অন্যতম। বিড়ম্বনা হচ্ছে ঐ সময় তদনীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার টাডা আইন প্রত্যাহার করে নেয়। তথাপি সুপ্রীম কোর্ট এই শাস্তিকে বজায় রাখে। ''সামাজিক ন্যায়ে''র প্রবল দাবিদার লালু বা নীতীশ জমানা রাজনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে এই ১৪ জন দণ্ডিত সি পি আই (এম এল) কর্মীকে মুক্ত করার স্পর্ধা দেখাননি। শাহাচাঁদজী সহ ৩ জন কমরেড বন্দী অবস্থায় প্রয়াত হলেন। এমনকি অন্তিম পর্যায়ে শাহাচাঁদজীর প্যারোলের আবেদনও খারিজ করে দেওয়া হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে এইভাবেই অভিব্যক্ত করা যেতে পারে যে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে!

কিন্তু গত ৩ নভেম্বর কমরেড শাহাচাঁদজীর অন্তিম যাত্রায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড দীপঙ্কর ভট্টাচার্য সহ বিহার রাজ্যের পার্টি নেতৃত্বের উপস্থিতিতে হাজার হাজার গরিব ও সংখ্যালঘু মানুষের দৃঢ়সংকল্প অংশগ্রহণ এই সংকেত দিচ্ছে যে বিহার তথা জাহানাবাদ-আরোয়ালে ব্যাপক গরিব ও শ্রমজীবী মানুষ তীব্র গণআন্দোলন ও রাজনৈতিক উত্থানের মধ্য দিয়ে জনতার দরবারে অন্তিম বিচার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন!

কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের সাম্প্রতিক প্রতিনিধি মোদী-অমিত শাহ কোম্পানী বিহারের বুকে সাম্প্রদায়িকীকরণে, সামন্তশক্তির পুনরুত্থান তথা গণতন্ত্রের উপর সর্বাত্মক আক্রমণের যে মহড়া শুরু করেছে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর গড়ে তুলতে কমরেড শাহাচাঁদজী হবেন আমাদের প্রেরণা ও আদর্শ।

- ডি পি বক্সী

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আর এক নির্ভয়া রেহানে জাব্বারি শুনিয়ে গেলেন মৃত্যুহীন অপরাজেয় কণ্ঠস্বর

শেষ পর্যন্ত সমস্ত আবেদন নিবেদনের আর্জি অগ্রাহ্য করে ফাঁসিই দেওয়া হল ইরানিয়ান মহিলা রেহানে জাব্বারিকে। ফাঁসির খবরটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা গভীর আলোড়ন তুলেছে গোটা বিশ্বজুড়ে। ২৬ বছরের জাব্বারির ফাঁসির রায় ঘোষণার পর থেকেই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও মানবাধিকার সংগঠন দাবি তুলেছিলেন রেহানার এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে। রেহানাকে খুনি সাব্যস্ত করে চরম শাস্তি দেওয়াটাকে চরম ভুল বলে মনে করেন তারা, সরব হয়েছিলেন রেহানার বিরুদ্ধে আনা খুনের অভিযোগের গোটা ঘটনাটিকে পুনর্বার খতিয়ে দেখার জন্য। কিন্তু ইরান সরকার বা ওদেশের বিচারব্যবস্থা কোন আবেদনেই সাড়া দেয়নি। শেষ পর্যন্ত গত ২৫ অক্টোবর তারা ফাঁসির আদেশটি কার্যকর করল।

২০০৭-এ জাব্বারির সাথে আলাপ হয়েছিল সর্বান্দি নামক জনৈক এক গৃহসজ্জা কারবারির। সর্বান্দি একটি ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের জন্য জাব্বারিকে তার অফিসে আসতে বলেন। জাব্বারির বয়ান অনুযায়ী সেখানে যাওয়ার পর সর্বান্দি তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। আত্মরক্ষার জন্য জাব্বারি একটি ছোট ছুরি তুলে নিয়ে সর্বান্দিকে আঘাত করেন এবং সেখান থেকে পালিয়ে যান। সর্বান্দি রক্তক্ষরণে সেখানেই মারা যান। জাব্বারির বয়ানকে অগ্রাহ্য করে সর্বান্দির পরিবার থেকে বলা হয় এটি একটি পরিকল্পিত খুন। ঘটনার দুদিন আগে জব্বারির ছুরি কেনার ঘটনাটিকে তারা এর সঙ্গে যুক্ত করে।

সর্বান্দির পরিবার থেকে আসা এই অভিযোগের ভিত্তিতে জাব্বারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁকে একটি নির্জন কুঠুরিতে বন্দী রাখা হয়। সেখানে তার সঙ্গে তার পরিবার তো বটেই, উকিলেরও যোগাযোগ করার কোনও উপায় ছিল না। ২০০৯-এ তেহেরানের আদালত তাদের রায়ে জাব্বারিকে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর ফাঁসির হুকুম দেয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানালের তথ্য অনুযায়ী জাব্বারী সর্বান্দিকে আঘাত করার কথা স্বীকার করেন কিন্তু এও বলেন বাড়ির অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে। বিশ্বখ্যাত এই মানবাধিকার সংগঠন জাব্বারীর বয়ানকে আদালতে আদৌ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি বলেও মত প্রকাশ করেন।

জাব্বরীর ফাঁসি নারীর আত্মরক্ষার অধিকার সহ অনেক বিষয়ের বিপন্নতাকেই সামনে এনেছে। ইরান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইন রাষ্ট্র বিচার ব্যবস্থার পুরুষতান্ত্রিক ঝোঁকের প্রতিফলনও রয়েছে এই শাস্তির মধ্যে।

জাব্বারীর শরীর শাস্তিপ্রাপ্ত হলেও মনের মুক্তি জেলের অন্ধ কুঠুরিতে শেষের দিন গুণতে গুণতেও যে অপরাজেয় ছিল, তার নজির রয়েছে মৃত্যুর আগে মাকে লিখে যাওয়া শেষ চিঠিটিতে। এই চিঠিতে তিনি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসুস্থ রোগীদের দেওয়ার অনুরোধ রেখে গেলেন আর এই পৃথিবীর একমুখী বিচারের যে ধরণ তাকে ফাঁসি দিল, তার বাইরে এক অন্য বিচারের প্রয়োজনিতাকে আভাসিত করে গেলেন। মানবিকতার জীবন স্পৃহায় জাব্বারীর লেখা চিঠিটির মধ্যে আমরা শুনতে থাকি মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো আর এক নির্ভয়ার অপরাজেয় কণ্ঠস্বর।

- সৌভিক ঘোষাল

নির্মাণ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের পোস্টাল পার্ক-রানিয়া লোকাল সম্মেলন

২ নভেম্বর এ আই সি সি টি ইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের পোস্টাল পার্ক-রানিয়া লোকাল কমিটি ইউনিটের প্রথম সম্মেলন বাঁশদ্রোণি পোস্টাল পার্ক অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে বাম ও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করে বেদীতে মাল্যদান করা হয় ও নীরবতা পালন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এ আই সি সি টি ইউ-র কলকাতা জেলা সম্পাদক দিবাকর ভট্টাচার্য ও পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের কলকাতা জেলা সম্পাদক প্রবীর দাস। সম্মেলনের শুরুতে খসড়া দলিল পাঠ করেন স্বপন রায়চৌধুরী, তারপর শ্রমিকেরা একে একে দলিল, বিভিন্ন দাবি ও অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা নিয়ে নিজেদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। উপস্থিত এ আই সি সি টি ইউ-র কলকাতা জেলা সম্পাদক শ্রমিক শ্রেণীর ওপর রাজ্য তথা কেন্দ্রের সার্বিক আক্রমণ ও বঞ্চনার ছবি তুলে ধরেন। স্বপন রায়চৌধুরীর জবাবী ভাষণের পর প্রস্তাবিত দলিল সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় ও দুজন মহিলা সদস্য সহ ১৩ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। সঞ্জয় মজুমদার সম্পাদক এবং স্বপন রায়চৌধুরী সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলনে উপস্থিত শ্রমিকদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত।

নারী আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী
বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিচল সৈনিক
কমরেড গীতা দাস
স্মরণ সভা
১৭ নভেম্বর বেলা ৩টা
স্থান ঃ ভারত সভা হল, বি বি গাঙ্গুলী (বৌবাজার) স্ট্রীট-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সংযোগ
আয়োজক ঃ সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি
সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত মন্ত্রী-সাংসদ চূড়ামণিরা

মোদী সরকারের ৪৪ জন পূর্ণমন্ত্রীর মধ্যে ১৩ জনের (৩০ শতাংশ) বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ঝুলছে।

তাঁদের মধ্যে ৮ জনের (১৮ শতাংশ) বিরুদ্ধে রয়েছে খুনের চেষ্টা, সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়ানো, অপহরণের মতো গুরুতর মামলা

মোট ৫৩ জন সাংসদের বিরুদ্ধে রয়েছে ফৌজদারি অভিযোগ
বিজেপিতে এ ধরণের সাংসদের সংখ্যা সর্বাধিক ২৪ জন
শিবসেনা দলে ৫ জন
তৃণমূল কংগ্রেসে ৪ জন
কংগ্রেসে ১ জন

যে সব মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে

উমা ভারতী (জলসম্পদ মন্ত্রী)—খুনের চেষ্টার দু'টি ও দাঙ্গার ছ'টি অভিযোগ সহ ১৩টি মামলা
নীতিন গড়করি (পরিবহণমন্ত্রী)—৪টি মামলা
উপেন্দ্র কুশওয়াহা (গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী)—৪টি মামলা
রাওসাহেব দাদারাও দানভে (ক্রেতাসুরক্ষা প্রতিমন্ত্রী)—৪টি মামলা
হর্ষ বর্ধন (স্বাস্থ্যমন্ত্রী)
ধর্মেন্দ্র প্রধান (পেট্রোলিয়াম প্রতিমন্ত্রী)
জেনারেল ভি কে সিং (উত্তর-পূর্বের উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী)
জুয়েল ওরাম (আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী)
মানেকা গান্ধী (নারী ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রী)
নরেন্দ্র সিং তোমর (খনি, ইস্পাত ও নিয়োগমন্ত্রী)
প্রকাশ জাভড়েকর (তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী)
রাম বিলাস পাসোয়ান (ক্রেতাসুরক্ষা বিষয়কমন্ত্রী)
সঞ্জীব কুমার বালিয়ান (কৃষি ও খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রতিমন্ত্রী)

— এই সময়, ২৮ আগস্ট ২০১৪

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com